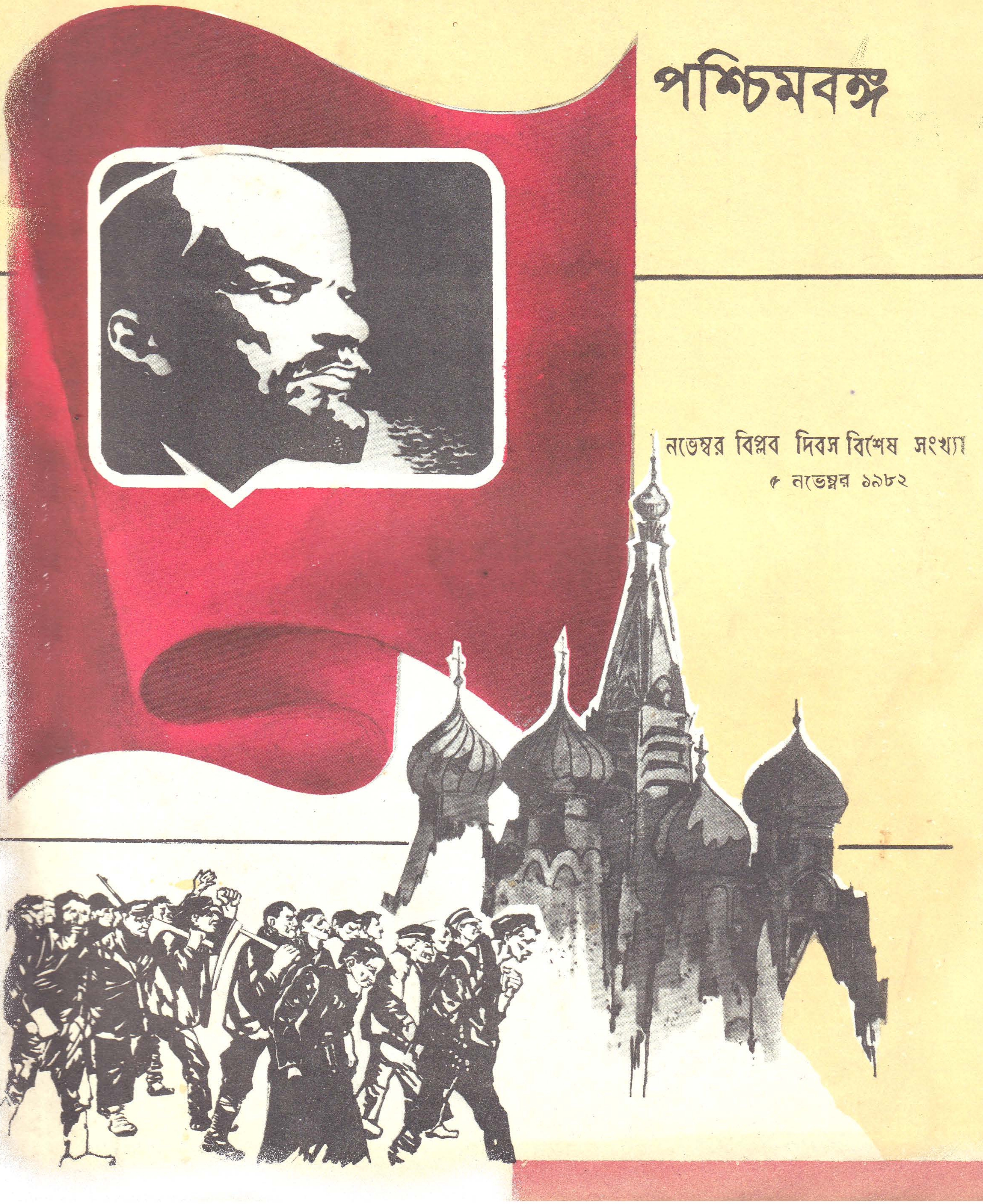
পশ্চিমবঙ্গ

নভেম্বর বিপ্লব দিবস বিশেষ সংখ্যা

৫ নভেম্বর ১৯৮২





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

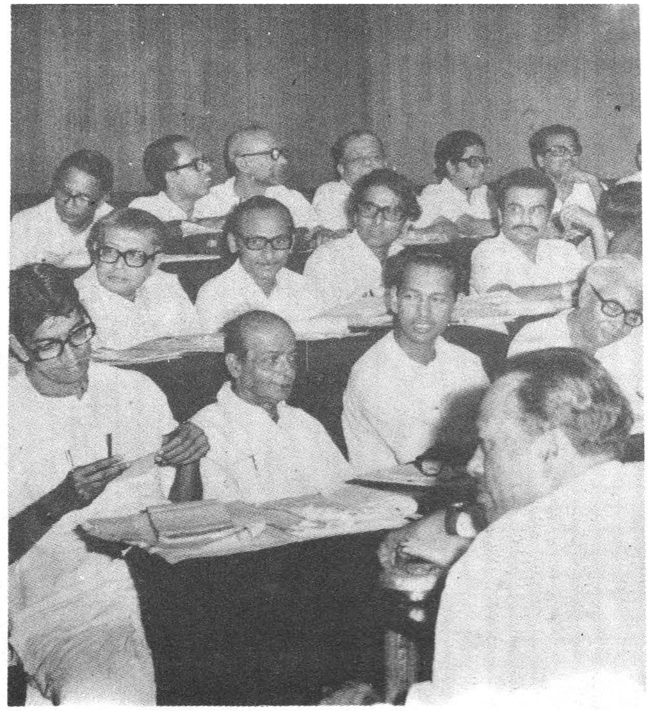
স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

সম্প্রতি মহাকরণের রোটাণ্ডায় রাজ্যের ভয়াবহ খরাপরিস্থিতি নিয়ে জেলা শাসক ও জিলা-পরিষদের সভাধিপতিদের সঙ্গে আলোচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু।

আলোকচিত্র—মধুসূদন ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

৫ নভেম্বর ১৯৮২ ১৮ কার্তিক ১৩৮৯

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।

ষান্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক

পার্থসারথি চৌধুরী

সম্পাদক ঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

এই সংখ্যার দাম ৫০ পয়সা

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

তথ্য অধিকর্তা,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩, আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০১

সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ, কলিকাতা-৭০০ ০০১

বিষয়সূচি

প্রচ্ছদ ঃ তারাপ্রসাদ দাস

অলংকরণ ঃ রণেন মুখোপাধ্যায় ও সমরেশ মুখোপাধ্যায়

নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে আলোকচিত্রগুলি ভারতস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের বার্তা বিভাগের সৌজন্যে

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ১৬ ॥ সংখ্যা ১৭ ॥ ৫ নভেম্বর ১৯৮২ ॥ ১৮ কার্তিক ১৩৮৯

দলমতনির্বিশেষে সংসদ সদস্যদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর পত্র

সর্বশক্তি নিয়োগ করে খরা-দুর্গত মানুষদের বাঁচাতেই হবে

—মুখ্যমন্ত্রী

বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় ভয়াবহ খরা পরিস্থিতি চলছে। অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। অবস্থা অপরিবর্তিত। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। মাঠের ধান এখন মাঠেই জ্বলছে। জল না পাওয়ায় গাছ শুকিয়ে উঠেছে, ধান পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। মোট ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ হয়তো দাঁড়াবে ৯৫০ কোটি টাকার মতো। এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। তাই আপনারা খরাত্রাণে কেন্দ্রীয় সাহায্য বাড়াতে চাপ দিন। সর্বশক্তি নিয়োগ করে খরা-দুর্গত মানুষদের বাঁচাতেই হবে।

৩ নভেম্বর ১৯৮২ কলকাতায় খরা-পরিস্থিতি আলোচনা করে দলমতনির্বিশেষে প্রত্যেক সংসদ সদস্যের কাছে প্রেরিত পৃথক পৃথক পত্রে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতিবসু খরা-জনিত পশ্চিমবঙ্গের অসহনীয় পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সাহায্য যাতে বেশি পাওয়া যায় তার চেষ্টা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। রাজ্যের খরা-পরিস্থিতিতে ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি স্মারকলিপিও শ্রীবসু ঐ পত্রগুলির সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

এইদিনই মহাকরণে কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহের ঘরে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে খরাজনিত পরিস্থিতিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হয়। কৃষি সচিব, কৃষি অধিকর্তা প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে, এ মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে ২৬ লক্ষ টন চালের ক্ষতি হয়েছে। গোটা রাজ্যে মোট আমন চাষের ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে গড়ে ৪৪ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে পুরুলিয়া জেলায়। প্রায় ৭০ শতাংশ। সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়েছে কোচবিহার জেলায়। প্রায় ২০ শতাংশ।

খরা-পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করে মুখ্য-সচিব শ্রীএস. ভি. কৃষ্ণাণ বলেছেন, প্রতিটি জেলা শাসকের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদে জানা গিয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে সংশোধিত রেশনের দোকানগুলিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ ঠিকই আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে চাল না থাকলেও গম আছে। গমের মজুত যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। যেসব অঞ্চলে রেশনে চালের পরিমাণ কমানো হয়েছে, সেখানে গমের পরিমাণ বাড়ানো হতে পারে। এখন খাদ্যবাহী ওয়াগন ঠিকমতই আসছে। ডি. ভি. সি-র জল ঠিকমতই পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ দৈনিক ১০ হাজার একর ফিট। আগামী সাতদিন পর্যন্ত এই জল পাওয়া যাবে।

রাজ্যের কৃষি-দপ্তরের একজন মুখপাত্র জানান, ডি. ভি. সি-র জল কোনো কোনো এলাকায় কেউ কেউ বেআইনীভাবে মজুত করছেন বলে যে গুজব রটেছে তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

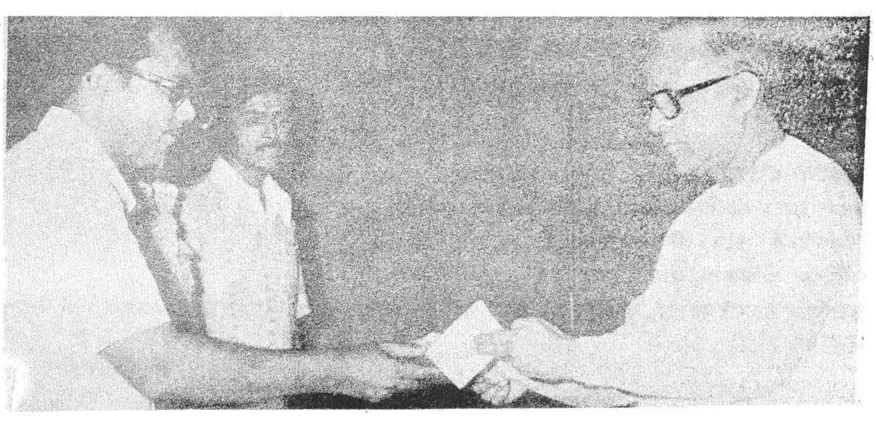
খরা-পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল আগামী ৮ নভেম্বর পশ্চিম-বঙ্গে আসবেন বলে মহাকরণ সূত্র থেকে বলা হয়েছে। সমীক্ষক দল ১১ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন খরা-পীড়িত জেলা সফর করবেন। তারা কোথায় কোথায় যাবেন তা ঠিক করা হবে সমীক্ষক দলটি আসার পরে।

মুখ্যমন্ত্রী খরা-এলাকা ঘুরে দেখবেন

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ৬ নভেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত খরাপীড়িত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলা সফর করবেন। সেখানকার জেলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি খরা-মোকাবিলায় ব্যবস্থাদির বিষয়েও আলোচনা করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীঅম্বরীশ মুখোপাধ্যায় এবং খাদ্য ও সরবরাহ-দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীঅচিন্ত্য রায়।

মুখ্যমন্ত্রীর খরা-ত্রাণ তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য করছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়নের প্রতিনিধি

আলোকচিত্র : বিমল ঘোষ



সেলুলার জেলের বন্দীজীবন ও নভেম্বর বিপ্লবের স্বপ্ন

গণেশ ঘোষ

বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশির বুকে নারকেল কুঞ্জে ঘেরা অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ আকাশের দিকে মাথা তুলে চেয়ে আছে। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব প্রত্যন্ত প্রদেশের এই দ্বীপগুলি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত। দূর থেকে মনে হয় যেন রূপকথার সাগর-কন্যা। কিন্তু এই সাগর-কন্যা আন্দামানই একদিন পরিণত হয়েছিল বিভীষিকার উপনিবেশে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অমানুষিক নির্যাতনের কলঙ্কিত কারাগারে। আর এই কারাগারে সুদীর্ঘ বন্দী জীবন যাপন করেছেন মাতৃভূমির স্বাধীনতা প্রয়াসী মুক্তিকামী বহু বীর সৈনিক। তাঁদের মধ্যে বহু সংখ্যক মৃত্যুভয়হীন বীর ফিরে যেতে পারেন নি স্বীয় জন্মভূমির স্নেহঅঞ্চল ছায়ায়। তাঁদের জীবনের শেষ আলোকণা নিভে গেছে আন্দামান দ্বীপের কুখ্যাত সেলুলার জেলের অন্ধকার কারাকক্ষে অথবা সমুদ্র পাহাড় ঘেরা আন্দামানের গভীর বনভূমিতে।

যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ও পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে। আমার স্মৃতিতে সেদিনের আন্দামান ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণের পৈশাচিক অত্যাচারের এক অভিশপ্ত ঘৃণিত কলঙ্কিত কারাগার। আজ সেই আন্দামান আমাদের দেশবাসী সকলের দৃষ্টিতে দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত শত শত দেশ-সেবকের দুঃখ বরণের মহিমায় উজ্জ্বল মহত্বের এক পুণ্য তীর্থপীঠ। এই তীর্থপীঠের প্রতিটি ধূলিকণার সাথে তিলে তিলে দুঃখ বরণের যে নীরব কাহিনী মিশে আছে তা অনাগত কালের মানুষের কাছে দেশাত্মবোধের প্রেরণা লাভের অনন্ত উৎস স্বরূপ হয়ে থাকবে।

আমি ঐতিহাসিক নই, তাই আন্দামানের ইতিহাস প্রসঙ্গে না গিয়ে সেলুলার জেলে অন্যান্য সঙ্গী বন্দীদের সাথে জীবনের কয়েকটি বছরের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তারই কিছুটা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি এই স্বল্পায়ত নিবন্ধে।

১৯২২-২৩ সালের পর বস্তুতঃ পক্ষে আন্দামানে কোনও রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন না, প্রায় সকলকেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কারাগারে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তখন কেবলমাত্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত সাধারণ কয়েদীদের পাঠানো হত এই নির্জন দ্বীপে এবং দ্বীপের ওই কুখ্যাত বন্দীশালায়। তাদের অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হত। চারিদিকে সমুদ্রে ঘেরা এবং হিংস্র হাঙর পরিবেষ্টিত এই সকল দ্বীপ থেকে পালিয়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত, তাই জেলের আচরণ ভাল হলে তাদের বন্দীশালার বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হত। দীর্ঘ মেয়াদী কয়েদীরা অনেকেই ওখানে বিয়ে করে ঘর সংসার করত, তাঁরা সাধারণতঃ আর দেশে ফিরে আসত না। এইভাবে আন্দামানের কয়েদী উপনিবেশ গড়ে ওঠে মানুষের উপনিবেশে।

১৯৩০ সালের ভারতবর্ষ ছিল অগ্নিগর্ভ। সুদীর্ঘ দাসত্বের বেদনা ও অমানুষিক শোষণের জ্বালা, অবমানিত ও লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বের ক্ষোভ এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বহ্নি দাবানলের রূপ নিয়ে সেদিন ভারতবর্ষে



আমাদের জয় সুনিশ্চিত, আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল : সংগ্রামী জনতার মধ্যে প্রিয় নেতা লেনিন।

আত্ম-প্রকাশ করে ; ফলে সেদিন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৌধের ভিত্তি টলটলায়মান হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলনের রূপ ও দ্রুত প্রসার সেদিন বৃটিশ শাসক দস্যুদের মনের শান্তি ও চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। চট্টগ্রাম ঢাকা ও মেদিনীপুর সর্বত্রই ওই বিদেশী শাসকদের অন্তরে আতঙ্ক, মনে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর গুলি বা বোমা বিস্ফোরণে কখন কোন অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের বিনিদ্র নয়নে চির নিদ্রার ছায়া নেমে আসে,—এই ভয় ছোট বড় সকল ইংরেজ কর্মচারীর মনে। কারা প্রাচীরের অন্তরালে কঠোর ভাবে আবদ্ধ বিপ্লবী বন্দিগণের সম্পর্কেও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হতে পারছিল না। বন্দী সিংহ যদি পিঞ্জরের বন্ধন ভেঙ্গে ফেলে গ্রাস করে সাম্রাজ্যবাদকে ; তাই ১৯৩২ সালে সুদূর লণ্ডনের পার্লামেণ্টে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ভারতের বিপ্লবপন্থী রাজবন্দিগণকে পূর্বের ন্যায় আবার দেশ থেকে বহু বহু দূরে অবস্থিত সমুদ্রে ঘেরা নির্জন আন্দামানের সেলুলার কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৩২ সালের ১৫ অগাস্ট তারিখে বাংলা দেশের ২৩ জন "বিপজ্জনক" রাজনৈতিক বন্দীকে নিয়ে সুবিখ্যাত জাহাজ "মহারাজা" কলিকাতা বন্দর ছাড়ে তিনদিন পর ১৮ অগাস্ট সকালে আন্দামানের ভূমিস্পর্শ করে। হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাঁধা এবং বহু সংখ্যক সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হয়ে আমরা ২৩ জন বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দী ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী কুখ্যাত সেলুলার জেলের বন্দীশালায় প্রবেশ করলাম।

এই বন্দীরা জেল গেট পার হয়ে ভিতরে যাওয়ার সময় সেলুলার জেলের জেলার গুরু গম্ভীর কণ্ঠে আগত বন্দীদের শুনিয়ে দিল : "মনে রেখ এখানে সিংহদের পোষ মানানো হয়" ("Don't forget lions are tamed here.") তার বলার ভঙ্গীতে মনে হল যে জেলার বাংলাদেশের বিপ্লবী বন্দীদের বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে "যত দুর্দান্তই হও না কেন এখানে পোষ মানতেই হবে এখানে কোন অবাধ্যপনা চলবে না।" জেলারের কথার সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে আমাদের একজন অল্প বয়স্ক তরুণ বন্ধু দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আমরাও বাংলা দেশের বাঘ।" ("We are also Royal Bengal tigers.") আমাদের তরুণ বন্ধুটির বলার ভঙ্গীতে এই কথাটাই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল যে সিংহকে পোষ মানানো গেলেও বাংলাদেশের সুন্দর বনের দুর্দ্ধর্ষ বাঘকে পোষ মানানো যায় না। বাংলাদেশের একজন কয়েদীর কাছ থেকে এই কথা শুনে জেলারের মুখ একেবারে মুহূর্তেই টকটকে লাল হয়ে উঠল এবং জেলার পেছন ফিরে একবার কটমট করে বন্দীদের দিকে তাকাল ; কিন্তু এই পর্যন্তই। বাংলাদেশের বিপ্লবী বন্দীদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই সত্য-মিথ্যা অনেক কথাই এই জেলারের জানা ছিল, সুতরাং সময় বিশেষে মৌনতাই বিজ্ঞের লক্ষণ মনে করে জেলার তখন আর কোন কথা বলাই সমীচীন মনে করেনি ; সে দ্রুত পায়ে তার অফিসে ফিরে চলে গেল।

এইবার দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দী হয়ে আন্দামান নির্বাসনে আমরা যাই প্রথম দল হিসাবে এবং আন্দামান থেকে ফিরে আমি একেবারে শেষ দল হিসাবে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে। আমরা আন্দামান থেকে চলে আসবার পর আন্দামানের সেলুলার জেলে ভারতবর্ষের আর কোন রাজবন্দী ছিলেন না এবং হয়ত সমগ্র আন্দামানেও দুই একজন ভিন্ন কোন বিপ্লবপন্থী বন্দীও ছিলেন না। অবশ্য তখনও সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহু সহস্র কয়েদী আন্দামানে বন্দী ছিল।

বিপ্লবপন্থী বন্দী বলে প্রথম দল হিসাবে আমাদের অল্প কয়েক জনকে বাংলাদেশ থেকে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেবার পর বাংলা, পাঞ্জাব ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে বহু সংখ্যক বিপ্লবপন্থীদের সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ভগৎ সিংহের সহকর্মী কয়েকজন বিপ্লবী বন্দীকেও তখন সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নানা বৈচিত্র্য ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বন্দীদের দিন কেটে যেতে লাগল। এক হিসাবে আমাদের কিন্তু সৌভাগ্যই বলতে হবে। এর আগে (১৯১০ থেকে ১৯২২) এই জেলের রাজবন্দিগণের উপর প্রতিনিয়ত প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যে নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন করত আমাদের উপর কিন্তু এবার সে রকম কিছু হয়নি। তবে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে তেমন বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধাও আমাদের জন্য ছিল না। আমাদের পক্ষেও এবার রাজনৈতিক বন্দীর সাধারণ সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা আদায় করে নেওয়া খুব সহজ সাধ্য হয় নি ; ক্রমাগত আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একটু একটু করে সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে হয়েছে এবং রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। এর জন্য অনশনও করতে হয়েছে। আন্দামানের অন্যতম একটি সবচেয়ে বেদনাদায়ক স্মৃতি হল এই যে ১৯৩৩ সালের অনশনে আমরা তিনজন অসম সাহসী মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবী সাথীকে হারিয়েছি। তার ফলে সুযোগ সুবিধাও আমাদের কিছু হয়েছে ; কিন্তু বিপ্লবী সহবন্দীদের হারিয়ে দেশের জাতির এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা আর কিছুতেই পূরণ হবার নয়।

সাধারণ কয়েদীদের চেয়ে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের খানিকটা সমীহ করে চলত। যখন কিছু সময়ের মধ্যে আমাদের সংখ্যা বাড়ল তখন আমাদের শক্তিও বৃদ্ধি হল ; সাথে সাথে আমাদের বেপরোয়া ভাবও কিছুটা বৃদ্ধি পেল। সাধারণ কয়েদীদের মত ঘানিটানা প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমের কোন কাজ আমাদের করতে হত না। প্রথম দিকে নারকেল ছোবড়ার দড়ি পাকাবার কাজ আমাদের দেওয়া হয়। প্রথম দিকে কাজটা কষ্টসাধ্য মনে হলেও তিন চার মাসের মধ্যে কাজটি আমাদের বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারও কয়েক মাস পরে যখন আমরা খুব দৃঢ়তার সাথে কর্তৃপক্ষকে জানালাম যে আমরা রাজনৈতিক বন্দী, এই কাজ আমরা কিছুতেই করব না, তখন জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য চরকায় সুতো কাটার কাজ দিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাও করিনি।

বাধ্যতামূলক বন্দী অবস্থায় এবং সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় দৈনন্দিন জীবনে ওই কয়েক শত রাজবন্দীর মনে অতি স্বাভাবিক ভাবেই একটি চিন্তা দেখা দিল : তারপর কি ? এবার তো যা করে এসেছি তার জন্য এই নির্বাসনে আসতে হয়েছে এবং আরও কত বছর এইভাবে কাটাতে হবে কে জানে ? কিন্তু এর ফলে মাতৃভূমির প্রকৃত মুক্তির সম্ভাবনা কতদূর এগিয়ে এসেছে ? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কি ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে ? এবং বৃটিশ দস্যুরা ভারতবর্ষ থেকে চলে গেলেও দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণ কি সত্য সত্যই মুক্তি পাবে ? দুঃখ দুর্দশা অনশন শোষণ অত্যাচার নির্যাতন চিরতরে লুপ্ত হয়ে ভারতের মানুষও কি সোবিয়েত রুশিয়ার জনসাধারণের ন্যায় শোষণহীন সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে ?

প্রায় এই ধরনের প্রশ্ন সেলুলার জেলে আবদ্ধ প্রায় প্রত্যেকটি রাজবন্দীর অন্তরেই দেখা দিয়ে তাঁকে ক্রমেই চঞ্চল ও উন্মনা করে তুলল ; যেমন অবশ্য সেই সময়ে ভারতের বিভিন্ন বন্দী শিবিরেও হয়েছিল। আন্দামানের কোন রাজবন্দীই নিজের মনে মনে চিন্তা করে এই সকল সমস্যার কোন সন্তোষজনক উত্তর খুঁজে পেলেন না ; ঘন ঘন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা করেও কেউ কোন আশার ক্ষীণ আলোকরশ্মিও দেখতে পেলেন না।

সেলুলার জেলে আবদ্ধ রাজবন্দিগণের প্রায় কেউই যথেষ্ট লেখাপড়া করবার সময় এবং সুযোগ পান নি ; তাঁদের শিক্ষার সম্পদ ছিল খুবই সীমিত। তাই গভীর চিন্তায় চিন্তায় তাঁদের মনেই আরও প্রশ্ন ও সমস্যা দেখা দিল ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী দেশে অতবড় বিপ্লব হোয়ে গেল, বহু সহস্র মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বিপ্লব সফল হল, রাজতন্ত্র অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কিন্তু ফরাসী দেশের ব্যাপকতম জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা শোষণ অনশন তো শেষ হয়নি এবং হ্রাসও পায়নি। ঠিক তেমনি অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রামে ইতালীর বহু সহস্র মানুষ প্রাণ দিয়েছে কিন্তু ইতালীর ব্যাপকতম জনসাধারণ তো সত্যি সত্যি মুক্তি পায় নি। তবে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের অবসান হলেও ভারতের ব্যাপকতম মানুষ কি প্রকৃত পক্ষে মুক্তিলাভ করতে পারবে ? তাদের শোষণ অনশন বেকারী অত্যাচার নির্যাতন কি সত্য সত্যই শেষ হয়ে যাবে ? তা যদি না হয় তবে আমাদের করণীয় কি ?

বন্দীদের মনের এই অবস্থায় পথের সন্ধানের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল আর একজন সহবন্দী ডাঃ নারায়ণ রায়ের কাছ থেকে। তিনি ১৯২৯ সালে টেগার্টকে আক্রমণ করবার অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মহারাষ্ট্রের যারবেদা জেলে কয়েক মাস বন্দী ছিলেন। সেখানে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির কিছু সংখ্যক সর্বোচ্চ স্তরের নেতার সাথে কথা বার্তায় এবং আলোচনায় ডাঃ নারায়ণ রায়ের সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা ও জ্ঞান হয়েছিল এবং তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কিত বেশ কয়েকখানি বই কিনে ফেলেন এবং ঠিক এই সময়েই তাঁকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নারায়ণদা তাঁর সব বইগুলি নিয়েই সেলুলার জেলের ভিতরে চলে আসেন।

নারায়ণদার তখন সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই পড়াশোনা করে তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে বেশ কিছুটা জ্ঞানও হয়েছে। নারায়ণদা এই অবস্থায় সেলুলার জেলের বন্দিগণকে সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে পড়াতে আরম্ভ করলেন। তখন সেলুলার জেলের সকল রাজবন্দিগণের ভিতরেই পড়াশোনা করবার প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে ; সকাল ৬টায় তালা খোলা থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা ৬টায় পুনরায় নিজ ঘরে তালা বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত সারাদিনই প্রায় পড়াশোনা এবং ক্লাশ আরম্ভ হয়ে গেল। এবং সকলের পড়াশোনা করবার বিষয় মাত্র একটিই—সমাজতন্ত্রবাদ। অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই সেলুলার জেলে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দিগণের প্রায় শতকরা ৮০/৮৫ জন বন্দীরই মনে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে মানুষের যথার্থ মুক্তির একমাত্র পথ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং নিজেদের চেষ্টায় আপসহীন সংগ্রাম ও সফল বিপ্লবের পথে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করে সমাজতন্ত্রবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এ ভিন্ন মানুষের প্রকৃত মুক্তির আর অন্য কোন পথই নেই। রুশিয়ার জনসাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে এই বিপ্লব সফল করে প্রকৃত মুক্তির ব্যবস্থা করেছে সুতরাং ভারতের জনগণের পক্ষেও এই ভারতবর্ষে নভেম্বর বিপ্লবের ন্যায় একটি সমাজ বিপ্লব সফল এবং সমাধান করেই নিজেদের যথার্থ মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে হবে।

সেলুলার জেলে আবদ্ধ রাজবন্দিগণের বেশির ভাগই নিজেদের মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন মুক্তির পর বাইরে গিয়ে ভারতের সাম্যবাদী দলের সাথে মিশে গিয়ে ভারতের জনগণকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে সচেতন ও সংগঠিত করে ভারতবর্ষে যথাসম্ভব সত্বর ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের ন্যায় একটি বিপ্লব সংগঠিত করে ভারতের জনগণের প্রকৃত মুক্তির পথ উন্মুক্ত করতে হবে। সেলুলার জেলের রাজবন্দিগণের মধ্যে যাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অন্তরে এই বিশ্বাস এবং তাঁদের চোখে ভবিষ্যতের এই স্বপ্নই স্থায়ী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হোল। সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে আরও জানবার আকাঙ্ক্ষায় সেলুলার জেলের সব ওয়ার্ডেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খুব গুরুত্বের সাথে পড়াশোনা চলতে লাগল ; এবং পড়াশোনার বিষয় কেবলমাত্র একটিই,—অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদ অর্থাৎ মার্কসবাদ। এই রাজবন্দিগণের পড়াশোনা যত এগিয়ে যেতে লাগল ততই তাঁদের মনে ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে লাগল এবং তাঁদের অন্তরের চোখে ভারতের ভবিষ্যৎ নভেম্বর বিপ্লবের স্বপ্ন আরও কিছুটা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন) ভারতবর্ষে বাস্তবে প্রযুক্ত এবং প্রবর্তিত হয় ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আইন সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকার পেলেন। আন্দামানে আবদ্ধ ভারতের রাজবন্দিগণ এই পরিস্থিতির সুযোগ নিলেন এবং তাঁদের অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়ে আনবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন। আন্দামানে নির্বাসিত বন্দিগণের ওই স্বাভাবিক দাবি ভারতের ব্যাপকতম জনগণের সমর্থনে শুধু জোরদারই হল না, শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভাবে সাফল্য লাভ করল। নির্বাসিত বন্দিগণের এই দাবির সমর্থনে সমগ্র দেশে জনমত সৃষ্টি হল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃগণও বন্দিগণকে দেশে ফিরিয়ে নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। সারা দেশে একটা সাড়া পড়ে গেল। দেশের সর্বত্র "আন্দামান দিবস" পালিত হল। সময়টা বোধ হয় ১৯৩৭ সালের অগাস্ট মাস।

জেলের ভিতরে আবদ্ধ থাকলেও জেল কর্তৃপক্ষের চাঞ্চল্য থেকে রাজবন্দীরা বেশ বুঝতে পারছিলেন যে অনুকূল আবহাওয়ায় বন্দিগণের সাফল্যের তরণী এগিয়েই চলেছে। কিন্তু সমগ্র ভারতের জনমতের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণের আদৌ ইচ্ছা ছিল না বিপ্লব-পন্থী ওই রাজবন্দিগণকে তখনই ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনতে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণের ইচ্ছা ছিল বিপ্লব-পন্থী ওই রাজবন্দিগণকে আরও বেশ কিছু কাল ওই ভাবে নির্বাসিত করে রেখে ভারতের তরুণ বয়স্কদের মনে আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করতে। শাসকদের ধারণা দেশের তরুণগণের মনে ভীতি সঞ্চার করতে পারলে বিপ্লব-পন্থী আন্দোলনে ভাটা পড়বে। তাই ওই বন্দিগণ যাতে আরও কিছু কাল আন্দামানে আবদ্ধ থাকে তার জন্য নূতন এক কৌশল এবং পন্থা নিয়ে অগ্রসর হয়ে এল এবার বাংলাদেশের গভর্নর স্বয়ং স্যার জন এণ্ডারসন। এই এণ্ডারসন এর পূর্বে আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তিকামী জনগণের উপর বীভৎস নারকীয় এবং অকল্পনীয় অত্যাচার করে পৃথিবীর জনমনে সর্বাপেক্ষা একজন ধিক্কৃত এবং ঘৃণিত ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়েছিল।

সেলুলার জেলের রাজবন্দিগণ তখন তাঁদের দাবির সমর্থনে আসন্ন গণ-অনশনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। এই সময়ে হঠাৎ তাঁরা একদিন দেখতে পেলেন বাংলার গভর্নর এণ্ডারসন সেলুলার জেল পরিদর্শনে এসে একে একে রাজবন্দিগণকে জিজ্ঞাসা করছে, তাঁরা কি চান ? এণ্ডারসন জিজ্ঞাসা করল বন্দীরা কি একটি ভাল ফুটবল খেলার মাঠ চায় ? তারা কি একটি ভাল বড় জলাশয় চায় সাঁতার কাটবার জন্য ? তারা কি ব্যায়ামের জন্য একটি ভাল ক্লাব চায় ? তারা একটি ভাল এবং বড় গ্রন্থাগার চায় ? গভর্নরের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বন্দিগণ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকলে একবাক্যে উত্তর দিলেন, "আমরা চাই শুধু দেশে ফিরে যেতে। আমরা আর কিছুই চাই না।" বন্দীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই উত্তর শুনে এণ্ডারসনের

লালমুখ আরও লাল হয়ে উঠল এবং কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে এণ্ডারসন জেলের বাইরে চলে গেল এবং পর দিনই বাংলাদেশে ফিরে গেল।

কিন্তু বাংলাদেশের বিপ্লব-পন্থী রাজবন্দিগণকে আরও কিছু কাল আন্দামানে আবদ্ধ করে রাখবার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা এইভাবে এই খানে শেষ হয়ে যায় নি। এণ্ডারসনের বাংলা দেশে ফিরে আসবার দশ-বার দিন পরে একদিন বেশ সকালে সেলুলার জেলের জেলার রাজবন্দিগণের ওয়ার্ডে এসে উপস্থিত হলেন। অত সকালে সাধারণতঃ জেলার কখনও রাজবন্দিগণের ওয়ার্ডে আসতেন না, তাই ওই সময়ে তাঁকে দেখে বন্দীরা বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, অত সকালে তিনি এসেছেন কেন? জেলার তখন হাসতে হাসতে বললেন যে, বন্দীদের জন্য একটি সুখবর আছে। কিসের সুখবর জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে বাংলা প্রদেশের রাজ্যপালের কাছ থেকে বন্দিগণের জন্য কিছু উপঢৌকন এসেছে। জেলার বন্দিগণের কয়েকজনকে তখনিই অফিসে ডাকলেন উপঢৌকনগুলি দেখে আসবার জন্য।

জেলার সাহেবের আমন্ত্রণে ৪/৫ জন রাজবন্দী আফিসে গিয়ে দেখেন ৪/৫ টি মাঝারি সাইজের কাঠের বাক্স, তার প্রত্যেকটির উপর বড় বড় করে লেখা আছে "বাংলার রাজ্য পালের কাছ থেকে সেলুলার জেলের রাজবন্দিগণের নিকট উপহার।" তখনিই কাঠের বাক্স গুলি খুলে যা দেখা গেল তা ছিল বন্দিগণের সকলের সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় এবং একেবারে ধারণার বাইরে। দেখা গেল কাঠের বাক্সগুলি বহু সংখ্যক পুস্তকে ঠাসাঠাসি ভাবে পূর্ণ এবং প্রত্যেকটি বইই সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কিত। একখানি বই ও অন্য কোন বিষয়ক নয়। এর উপর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা ঠিক যে ইংরেজ শাসকেরা জানতে পেরেছিল যে সেলুলার জেলের বন্দীরা মার্কসবাদ সম্পর্কে খুব পড়াশোনা করছে; তাই তারা ভেবেছিল মার্কসবাদ সম্পর্কিত কিছু বই পেলে বন্দীরা হয়ত বই ফেলে রেখে দেশের জেলে ফিরে যেতে চাইবে না।

যাক, অবশেষে জনমতের প্রবল চাপে সাম্রাজ্যবাদী দম্ভকে নতিস্বীকার করতে হল। এর পর শুরু হল ঘর ছাড়া আন্দামানের বন্দীদের ঘরে ফেরার পালা। পরাজয়ের গ্লানি আর বন্দিজীবনের অবসন্নতা নিয়ে নয় বিজয়ীর গর্বে। তাঁদের দাবি দেশের জনসাধারণ জাতীয় দাবি মনে করে যে আন্দোলন করেছিলেন তার কাছে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণের অনড় সঙ্কল্পকে হার মানতে হয়েছিল। আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দিগণের কাছে এই বিজয়ের আনন্দ তাঁদের ঘরে ফেরার আনন্দের চেয়েও আরও অনেক বড়। এই আনন্দে তাঁরা ভুলে গেলেন গৃহ থেকে দূরে থাকার বেদনা, নির্বাসিত জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা। একে একে বন্ধুরা চলে গেলেন সেলুলার জেল পরিত্যাগ করে; কেবলমাত্র শেষ ১০৫ জনের দেশে ফিরে যাওয়ার কোন ব্যবস্থাই সরকার করল না। এবং বেশ কিছু দিন কেটে যাওয়ার পরও এঁদের ফিরিয়ে নেওয়া সম্পর্কে সরকার উচ্চ-বাচ্য কিছুই করল না। রাজবন্দীরা কিন্তু তাঁদের এই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেননি। তাঁরা প্রাণপণে সরিয়ে দিলেন নৈরাশ্যের অন্ধকার, হুমকি দিলেন পুনরায় অনশন আরম্ভ করবার। কর্তৃপক্ষ এতেও অনড় অটল এবং অচল রইল; কিন্তু অনশনের বাস্তব প্রস্তুতি হিসাবে এই বন্দীরা যেদিন সকালে "ক্যাস্টর অয়েল" সেবন আরম্ভ করলেন তখনই জেল এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গনলো এবং আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সরকার নূতন কোন আন্দোলনের সম্মুখীন হতে চায় না। তাই সর্বতোভাবে প্রশাসনিক প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল বন্দিগণকে অনশন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার। আন্দামানের চিফ কমিশনার অনশনে উদ্যত রাজবন্দিগণকে এই বলে প্রতিশ্রুতি পাঠিয়ে দিলেন যে আগামী দশ দিনের মধ্যেই তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাস্তব ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রতিশ্রুতির পর বন্দীরাও অনশন শুরু করা থেকে বিরত হলেন।

অল্প কয়েকদিন পরেই অবশেষে অবশিষ্ট রাজবন্দিগণের দেশে ফিরে যাওয়ার দিনটি সত্যসত্যই এসে গেল; খুব সম্ভব সে দিনটি ছিল ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ। আমাদের জাহাজ ছাড়ল; আন্দামান ছেড়ে সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দিগণের শেষ দলে আমরা চললাম ফেলে আসা দেশের দিকে। বঙ্গোপসাগরের নীল জলের উপর রাজহংসের মত সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের জাহাজ। দূরে দিগন্তবলয়ে বিলীয়মান হয়ে আসছে নারিকেল কুঞ্জ শোভিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে তমাল ও তাল বৃক্ষের চিহ্ন মাত্র চোখে না পড়লেও বারবার মনে হতে লাগল মহাকবি কালিদাসের লেখা রঘুবংশের সেই বিখ্যাত শ্লোক :—

"দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী তমালতালী
বনরাজি নীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারা নিবদ্ধেব
কলঙ্ক-রেখা।"



সাম্প্রতিককালে নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে ঐতিহাসিক রেড স্কোয়ারে জনগণের মিছিল।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্ত এবং নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা

॥ মাখন পাল

দুনিয়া কাঁপানো দশটি দিনের আবির্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে পয়ষট্টি বছর আগে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে। জার শাসিত রাশিয়ার ধ্বংসস্তূপের উপর সেদিন জন্ম নিয়েছিল সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র—কমরেড লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। তারপর থেকে সারা দুনিয়া জুড়ে সেতুর নিচ দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সব দিক দিয়েই, পৃথিবী সেদিন যেমন ছিল আজ আর তেমন অবস্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে নেই, পরিমাণগত এবং গুণগত নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ইতিমধ্যে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের মত প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ, তাও ১৯৩৯ সালে শুরু হয়ে নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৪৫-৪৬ সালে শেষ হয়েছে। তারপর এযাবৎ অনেকগুলি বছর কেটে গেছে, সাধিত হয়েছে রকমারি পরিবর্তন। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ তথা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে ১৯১৭ সালে রুশদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল, তার মৌলিক মর্মবাণী এখনও কিন্তু অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। কমরেড স্তালিন যে অর্থে লেনিনবাদকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুগে এবং সমাজতান্ত্রিক যুগের মার্ক্সবাদ' বলে অভিহিত করেছেন তা যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং তা নিশ্চয়ই সঠিক শুধু নয়, বাস্তব সত্য, তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ ধনবাদের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এই মূল বক্তব্যগুলির মূলগত কোন হেরফের হবে না। এই বক্তব্যগুলি হলো ঃ—

এক—শ্রেণী বিভক্ত সমাজে, শ্রেণী-সংগ্রাম তথা শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম অব্যাহত থাকে ;

দুই—এই শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতি হবে সফল শ্রেণী বিপ্লব তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ;

তিন—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অস্থায়ী অনিবার্য রাষ্ট্ররূপ হবে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব ,

চার—শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক বক্তব্যগুলি স্মরণ রেখেই বর্তমান যুগের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত ও তার প্রতিরোধে করণীয় কি, তা স্থির করতে হবে।

॥ দুই ॥

শুধু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত নয়, সারা দুনিয়া যে তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা আজ



দুনিয়ার অবাঞ্ছিত জঞ্জাল পরিষ্কার করছেন লেনিন : একটি কার্টুন চিত্র

প্রায় বাস্তব সত্য হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করার সদিচ্ছা হিসাবেই হোক, আর সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই হোক শান্তির সপক্ষে আপ্তবাক্য অতীতেও শোনা গেছে, আজও তার অন্ত নেই। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের কালে বলা হয়েছিল—ভবিষ্যতে যেন আর যুদ্ধ না হয় তার জন্য এই যুদ্ধ। (war to end war); দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালে বলা হয়েছিল, এই যুদ্ধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ (war for Democracy); আরও বলা হয়েছিল-এই যুদ্ধ পাঁচ রকমের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ (war for five freedoms)। কিন্তু কোন আপ্তবাক্যই কি এ যাবৎ কার্যে রূপায়িত হয়েছে? প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। ব্যাপ্তি ও ধ্বংস ক্ষমতা সেই যুদ্ধের হানাহানি প্রথম যুদ্ধকে তো হার মানিয়ে গেছেই, এমন কি হিরোসিমা-নাগাসাকি তে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের মারাত্মক পরিণতি আজও বিশ্ব-মানবতাকে আতঙ্কিত করে তোলে। তবু তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলার তাগিদে সারা দুনিয়া ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী শক্তিগুলি চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছে। পারমাণবিক বোমার স্তূপীকরণ চলেছে দেশে দেশে। কিন্তু কেন? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেক-দিন আগেই ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরের চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গে কমরেড লেনিন যা বলে গেছেন তার সারাংশ হল ঃ—

এক—ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও মূলধনের কেন্দ্রী-করণ এমন উচ্চস্তরে পৌঁছায় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক-চেটিয়া মূলধনের আধিপত্য হয় সুপ্রতিষ্ঠিত।

দুই—ব্যাঙ্ক মূলধন ও শিল্প মূলধন একত্রিত হয়ে মূলধনী পুঁজির (Finance Capital) ভিত্তিতে মূলধনীতন্ত্র (Capitalist Oligarcy) স্থাপিত হয়;

তিন—পণ্য রপ্তানির পরিবর্তে মূলধন রপ্তানি অতিশয় গুরুত্ব পায়;

চার—আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির কারবারীরা সারা দুনিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়;

পাঁচ—সারা দুনিয়ার সমস্ত অঞ্চলগুলি (Territory) বৃহত্তর শক্তিগুলির মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

ধনতন্ত্রের প্রসার লাভের আনুষঙ্গিক এই অবস্থাই হল অনিবার্য পরিণতি। কমরেড লেনিনের ভাষায়—একেই বলে সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রের উচ্চতম স্তর। এই স্তরে উন্নীত হবার পর ধনতন্ত্রের পক্ষে আর প্রসার বৃদ্ধির কোন সুযোগ থাকে না। মার্ক্সের ভাষায়—বৃদ্ধ দম্পতি যেমন পরিবারকে আর কিছু দিতে পারে না, একমাত্র বার্ধক্যজনিত রোগ ছাড়া এটাও তেমনি। ফলে অর্থনৈতিক সংকট এবং তারই আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক সংকট অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। ধনবাদী অর্থনীতিবিদগণ প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেরআগে এবং কিছুদিন পরেও এই সংকটের পরিমাপ করতে গিয়ে বলতেন—প্রতি পাঁচ বছর পরপর অর্ধ সংকট (sub-crisis) দেখা দেয় এবং তা পরিপূর্ণ সংকটের রূপ নেয় প্রতি দশ বছর পর পর। প্রথম সাম্রাজ্য-বাদী মহাযুদ্ধের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কিছুকাল পর্যন্ত এই পর্যায়ক্রমিক পরিমাপ আংশিকভাবে সঠিক থাকলেও, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে সংকটের তীব্রতা, ব্যাপকতা ও গভীরতায় প্রায় গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। এ যেন পূজাবাটিতে ঢাক বাজনার কালে ঢাকের কাঠির উঠানামার মত অনেকটা—প্রথমে ধীরে ধীরে, পরের দিকে কাঠিগুলি এমনভাবে উঠানামা করে যে, সাধারণ দৃষ্টির সামনে তা প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়, বাস্তবিক দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর ধনবাদী সংকটের অবস্থা অনেকটা প্রায় সেইরূপ। সংকটের তীব্রতা, ব্যাপকতা ও গভীরতা এমন দ্রুতলয়ে উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে যে, কখন সংকটের অবসান হচ্ছে, আবার কখনও বা নূতন সংকট শুরু হচ্ছে, তার হিসাব রাখা কঠিন। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে, ধনবাদী সংকটের আবর্তে ঘূর্ণায়মান এই বিশ্বে বিগত বছরগুলিতে ছোট খাটো ও স্থানীয়ভাবে সংঘটিত যুদ্ধ ক্রমাগত লেগেই রয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনামের যুদ্ধ, ইরাক ইরানের যুদ্ধ, ইসরাইল-লেবাননের যুদ্ধ ও ফক্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ তো রয়েছেই, তা ছাড়া ঠাণ্ডা যুদ্ধ (cold war) তো সদা বিরাজমান; এর থেকে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কমরেড লেনিনের উক্তির সত্যতা সর্বাংশেই প্রমাণিত। কমরেড লেনিন বলেছেন-"Imperialism is nothing but the moribund and decaying stage of finance capital" (সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের মরণাপন্ন এবং শুকিয়ে মরার স্তর ছাড়া আর কিছু নয়) এই স্তর থেকে ধনতন্ত্রের আর বাঁচার পথ নেই এবং এই কারণেই কমরেড লেনিন এই যুগকে শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ বলেই বর্ণনা করেননি, বাস্তব কর্মের মধ্য দিয়ে রুশ দেশে তাকে সফল করেও গেছেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ধনিকশ্রেণী এখন আর চোখবাঁধা বলদের মত স্বখাত সলিলের দিকে এগিয়ে যায় না। এ যুগের ধনিকশ্রেণী অত্যন্ত সচেতন, তারা জানে ধনবাদী সংকটের অপরপিঠে রয়েছে বিপ্লব। সুতরাং সংকট গ্রস্থ ধনিকশ্রেণী এই বিপ্লবের হাত থেকে মুক্তির জন্য নূতন পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে। এই পথ

ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদ বলেই অভিহিত। কমরেড লেনিন একে বলেছেন—"Last ditch of capitalism" (ধনতন্ত্রের বাঁচার শেষ গহ্বর)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদে এই উত্তরণ কোন কোন মার্ক্সবাদী মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অথচ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে কিন্তু এমন ভুল করা ঠিক হয়নি, কারণ লেনিন তো বটেই এমন কি স্তালিনও একথাই বলেছেন যে—'Imperialism is the veiled dictatorship of finance capital' "এবং Fascism is the naked dictatorship of finance capital" (সাম্রাজ্যবাদ হল মূলধনী পুঁজির বোরখাপরা একনায়কত্ব এবং ফ্যাসীবাদ হল মূলধনী পুঁজির নগ্ন একনায়কত্ব)। মূল ধনতন্ত্র থেকে এদের উৎপত্তি, এরা যমজভাই এবং একই গোত্রভুক্ত (They are twins and not antipods)। মোট কথা হলো গণতন্ত্রের মুখোশ বজায় রেখে যতদিন ধনতন্ত্র আত্মরক্ষা করতে পারে ততদিন পর্যন্তই ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের রূপ গ্রহণ করেই চলে ; কিন্তু সংকটের আবর্তে সাধারণ মানুষ যখন বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং ধনতন্ত্র আত্মরক্ষার জন্য গণতন্ত্রের মুখোশটাও বজায় রাখতে পারে না তখনই তারা 'ডণ্ডা নিয়ে জনসাধারণকে ঠাণ্ডা' করার নগ্নরূপ নিয়ে হাজির হয়। একেই বলে ধনবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ফ্যাসীবাদে রূপান্তর। এদের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা তা হল পরিমাণগত। দুঃখের বিষয় হল, এত সব সত্ত্বেও মার্ক্সবাদী মহলেও বিভ্রান্তির কারণে বিগত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালে প্রথম মহাযুদ্ধের চাইতেও অনেক বেশি ধনবাদী সংকটের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর কোন দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হল না।

॥ তিন ॥

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে ধনবাদ সাম্রাজ্যবাদের অবস্থার সঙ্গে পরবর্তী অবস্থায় যে পার্থক্য রয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে না হলেও অন্তত সংক্ষেপে না বললে চলে না। যুদ্ধ শেষ হয়, এমন সময় দেখা যায় রূজভেল্ট-চার্চিল এবং স্তালিন 'ইয়ালটা' এবং 'তেহেরানে' পর পর বৈঠকে বসেন। এঁদের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হল। আরও সম্পাদিত বিশ বছরের জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ও বাণিজ্যিক চুক্তি। দেখে মনে হল, বোধ হয় 'ধনতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহ অস্তিত্বের তত্ত্ব (Theory of peaceful co-existence between socialism and capitalism) সত্যি সত্যি বাস্তবে রূপায়িত হল ; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই দীর্ঘ পুরাতন প্রবাদ বাক্যের কথা—'কাজের সময় কাজী কাজ ফুরালেই পাজী' অথবা ফলের বিপরীত জলের রেখা ইত্যাদি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে বৃটেন ফ্রান্স সহ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী নূতন নূতন যুদ্ধ জোট ন্যাটো (NETO) সিয়াটো (SEATO) মেডো (MEDO) প্রভৃতি তৈরি করা শুরু হয়ে গেল। উদ্দেশ্য, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলি যেন আর এক পাও সামনে আসতে না পারে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারার এতটুকু হাওয়াও যেন সাম্রাজ্যবাদ-ধনবাদের দেশে প্রবেশাধিকার না পায়। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী শিবিরের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 'মার্শাল প্ল্যান' (Marshall plan) এবং ইউরোপের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা (ERP)। বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে দেখল—একেবারে বিপরীত চিত্র ; যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ের দিনগুলির সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। মনে হল সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শক্তিগুলি সম্মিলিত ভাবে তাদের মূল শ্রেণী শত্রু—সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলিকে পায়ের তলায় পিশে মারার জন্য তৈরি হচ্ছে।

কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই দেখা দিল ভিন্ন অবস্থা। যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের দেশগুলি—পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি নিজ নিজ দেশের উৎপন্ন পণ্যের জন্য বাজার খুঁজে পাচ্ছে না। এদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আগের মতই এ সকল দেশের বাজারে পণ্য রপ্তানি করে চলেছে। এমতাবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের দেশগুলি গড়ে তুলল ইউরোপীয় বারোয়ারী বাজার (ECM), যেখানে মার্কিন দেশ থেকে কোন পণ্য এই বারোয়ারী বাজারে রপ্তানি নিষিদ্ধ হল, শুরু হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বারোয়ারী বাজারের দেশগুলির অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব, যার অনিবার্য পরিণতি রূপ নিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে। ফলে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী দেশগুলি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি ; দুই) পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সের নেতৃত্বে ইউরোপীয় বাজারের দেশগুলি ; (তিন) শিল্পোন্নত জাপান। এদের একের সঙ্গে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দ্বন্দ্ব এখন আর মোটেই অস্পষ্ট নয়। এর পেছনে যে ধনবাদী অর্থনৈতিক সংকট মারাত্মক ভাবে কাজ করেছে এবং করছে, তাও বিস্তারিত ভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না।

শুধু তাও নয়। এই তিনটি মূল সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং রেষারেষী এমন স্তরে পৌঁছেছে যে,

সাম্রাজ্যোবাদী-ধনবাদী দেশগুলি তাদের শ্রেণী শত্রু—সোভিয়েত রাষ্ট্র ও জনগণতান্ত্রিক চীনসহ সাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির সঙ্গে নানা ধরনের চুক্তি সম্পাদন করে একদিকে আত্মরক্ষা অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের অপর গোষ্ঠীকে পরাজিত করার পথ খুঁজছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং জনগণতান্ত্রিক চীনসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলি যদি সম্মিলিত ভাবে সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের কোন একটির সঙ্গে যোগ দিত, তবে হয়তো বলা যেত যে, সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে তারা সাময়িকভাবে আত্মরক্ষার পথ নিচ্ছে ভবিষ্যতের বিশ্ববিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনে। কিন্তু বাস্তবসত্য তা নয়। এদেরও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও রেষারেষী আজ আর মোটেই অস্পষ্ট নয়। ফলে যেখানে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির সম্মিলিত ভাবে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করার কথা, তার পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে সেখানে সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের বিভিন্ন গোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক শিবির বিশেষ করে, সোভিয়েত রাষ্ট্র ও জনগণতান্ত্রিক চীনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিচ্ছে। মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিনসহ মার্ক্সবাদী নেতৃবৃন্দ যে কথা বার বার বলেছেন যে, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে কোন স্বার্থ সংঘাত নেই, যেহেতু এদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ তো দূরের কথা অর্থনৈতিক বা সীমানা সংক্রান্ত রেষারেষী থাকতে পারে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায় চীন ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী উসুরি নদীর (usuri river) উভয় তীরে উভয়ের পক্ষে শত শত ডিভিসন সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে এটা অদ্ভুত ট্র্যাজিডি।

এমতাবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ-ধনবাদের যুগে কমরেড লেনিন যে চারটি বিরোধের কথা উল্লেখ করেছিলেন তার সঙ্গে আর একটি বিরোধ—পঞ্চম বিরোধ যুক্ত হল বললেও নিশ্চয় ভুল বলা হবে না। এই বিরোধগুলো হল ঃ ১) সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী দেশগুলির নিজ নিজ দেশে ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণীর বিরোধ। ২) সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে বিরোধ। ৩) সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে তাদের ঔপনিবেশিক জনগণের মধ্যে বিরোধ (দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধোত্তর কালে অনেকগুলি ঔপনিবেশিক দেশই রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে এবং ঐসব দেশের ধনিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এসেছে) ৪) সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরোধ।

এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্বে উল্লিখিত এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত নূতন বিরোধ—সোভিয়েত রাষ্ট্র ও জনগণতান্ত্রিক চীনসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির নিজেদের মধ্যে বিরোধ। এই বিরোধ মূলত অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সীমানা সংক্রান্ত, যা তাদের প্রায় যুদ্ধের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। মানুষের মনে স্বভাবতই হতাশা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এই দেশগুলোকে আদপেই সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে অভিহিত করা যায় কি না?

॥ চার ॥

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ এই আস্থা নিয়ে বুক বেঁধেছিল যে, সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং জনগণতান্ত্রিক চীনসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলি সম্মিলিত ভাবে সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে একেবারে বিপরীত চিত্র। সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের বিভিন্ন গোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করেছে। এর থেকে একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শিবিরের যারা চীন এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি, অনাক্রমণ চুক্তি, বাণিজ্যিক চুক্তি বা এ ধরনের কোন চুক্তি সম্পন্ন করেছে, সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের সেই গোষ্ঠী-গুলি হয়তো প্রগতিশীল আখ্যায় আখ্যায়িত হতে পারে (ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রের মৈত্রী চুক্তি হবার ফলে যেমন কেউ কেউ মনে করে যে, ভারতের ধনবাদী সরকার প্রগতিশীল হয়ে গেছে)। কিন্তু এমন ধারণা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্মত তো নয়ই, এমনকি বাস্তব সম্মতও নয়। কারণ সাম্রাজ্যবাদ-ধনবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব যদি অনস্বীকার্য না হয়, তবে সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র মূলত পরস্পরের শ্রেণী শত্রু। এই উভয়ের মধ্যকার বিরোধই হল মূলত এ যুগের প্রধান বিরোধ এক কথায় ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক সামাজিক অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিরোধই হল মৌলিক বিরোধ। সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদী শক্তি সমূহের কোন না কোন গোষ্ঠী সেই বিরোধকে সাময়িকভাবে ঠাণ্ডা ঘরে (cold storage) রেখে অপর সাম্রাজ্যবাদী ও ধনবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে সুযোগ গ্রহণ করে, তা দেখে এই মৌলিক শ্রেণীগত বিরোধের কথা ভুলে যাওয়া নিছক ইতিহাস-চেতনাহীনতা দূরদৃষ্টিহীনতার পরিচায়ক এবং মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে পারে না।

মার্ক্স এবং এঙ্গেলস বিগত শতাব্দীতে এ সম্পর্কে বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। কমরেড লেনিন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লব সম্পাদন

করার পর বার বার ঘোষণা করেছেন যে, পৃথিবী দুটি ভাগে ভাগ হয়েছে। যত অসম্পূর্ণ ভাবেই হোক না কেন একটি ভাগকেই বলা হয় সমাজতান্ত্রিক অংশ অপরটিকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী অংশ—(After the November Socialist Revolution in Czarist Russia, the world is clearly divided into a Socialist part however imperfect.... and a capitalist part, based on the concentration of the social means of production in the hands of small national groups · of monopoly capitalist....)। এদের বিরোধ হচ্ছে মৌলিক। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদীদের নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পরস্পরকে পরাজিত করার তাগিদে এরা অনেক সময় শ্রেণী শত্রু সমাজ-তান্ত্রিক অংশের সঙ্গেও হাত মেলায়। তাই বলে এরা প্রগতি-শীল হয়ে যায় না। সময় এবং সুযোগ পেলে শ্রেণী শত্রু সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে এতটুকু দ্বিধা করে না। পূর্বে উল্লেখিত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের শেষদিকের অবস্থা এবং যুদ্ধের পরবর্তী দিনগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের কার্যাবলী কমরেড লেনিনের উপরোক্ত বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে।

॥ পাঁচ ॥

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে যে তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তা অবশ্যই উপরোক্ত পটভূমিকায়। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী ধনবাদীদের কোন গোষ্ঠী সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে এবং কোন গোষ্ঠী জনগণতান্ত্রিক চীনের সঙ্গে যোগা-যোগে যদি এই যুদ্ধ শুরু করে অথবা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কোন সময়ে যদি কোন ধরনের মৈত্রী চুক্তি, অনাক্রমণ চুক্তি বা পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করে, তবু এই যুদ্ধের কোন গুণগত বা চরিত্রগত পরিবর্তন হবে না, এই যুদ্ধ তখনও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই থেকে যাবে এবং প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালে কমরেড লেনিন যে মূল শ্লোগান তুলে বিশ্বের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তাও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে ঃ তা হল 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর' (Turn the imperialist war into civil war)। সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী সংকট তীব্রতা, ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক দিয়ে আজ যে পর্যায়ে উঠেছে, সেখানে এটাই প্রত্যাশিত ছিল যে, চীন, রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলি সম্মিলিত ভাবে সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করবে। এদের নেতৃত্বই সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী দেশের শ্রমিক-শ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনগণকে এই বলে আহ্বান জানাবে যে, নিজ নিজ দেশের ধনবাদী শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও একথা সত্য যে, বর্তমানে সে অবস্থা নেই এবং অদূর ভবিষ্যতেও তেমন শুভ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় নভেম্বর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার আলোকে এবং লেনিনবাদী আন্তর্জাতিকতার কথা মনে রেখে প্রত্যেক দেশের জনগণকে সংগঠিতভাবে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চরম ব্যর্থতার পর প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের কালে কমরেড লেনিনের নির্দেশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'There is one and only one kind of internationalism in deed ; working whole heartedly for the development of revolutionary movement and revolutionary struggle in ones own country and supporting (by propaganda, sympathy and material aid) such and only such a struggle and such a link in every country without exceptions.'

Anything else is deception or Manilovism & fruitless day dreaming—Lenin : Task of the Proletariat in our revolution (মর্মার্থ ঃ 'এক ধরনের এবং সত্যকার অর্থে এক ধরনের আন্তর্জাতিকতাই আছে। নিজের দেশের বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য মনেপ্রাণে কাজ করা এবং এই আন্দোলনকে কেবল মাত্র এরূপ আন্দোলনকেই প্রচার, সহানুভূতি ও অন্যান্য প্রকার বাস্তব সাহায্য দান করে সমর্থন করা। কোনরূপ ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রত্যেক দেশেই বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতা এরূপ সংগ্রাম নির্ভর।'

॥ ছয় ॥

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালে সফল নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবী মানুষের যা করণীয় বলে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, আসন্ন তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালেও তাই যে সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী দেশগুলিতে-ধনবাদী দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের একমাত্র কারণীয় কাজ তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে যুদ্ধ বন্ধ করার নাম করে তথাকথিত শান্তিবাদীরা যে শান্তি আন্দোলন শুরু করে-ছিল, বিশেষ করে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালে সোভিয়েত

রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রশক্তি তথা বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি (mutual assistance pact) সম্পন্ন হওয়ার পর জনমনে, এমন কি কোন কোন মার্ক্সবাদী মহলেও যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে এবার প্রথম থেকেই সতর্ক হওয়া দরকার। কারণ পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতার উল্লেখ করে তথাকথিত শান্তিবাদীরা ইতিমধ্যেই বিশ্বের জনগণকে বিপ্লবের পথ থেকে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার প্রচেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। অথচ কমরেড লেনিন শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন—'The propaganda of peace unacompanied by a call for revolutionary mass action can only sow illusions and turn the proletariat into a plaything in the hands of the secret diplomacy of the belligarent country.'

(মর্মার্থ—'বিপ্লবী গণ সংগ্রামের আহ্বান হতে বিচ্ছিন্ন বিশ্ব-শান্তির প্রচার আন্দোলন সর্বহারা যুদ্ধবাদী দেশ সমূহের গুপ্ত কূটনীতির খেলার পুতুলে পরিণত করে')।

শুধু তাও নয়। এক সময়ে এমন কি ট্রটস্কী প্রমুখ নেতারাও যখন কমরেড লেনিনের উপরোক্ত নির্দেশের বিরোধিতা করতে গিয়ে বললেন যে, যখন সমস্ত বামপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য শান্তি আন্দোলন শুরু করেছেন, তখন এই আন্দোলনে যোগ দেবার কথা ঘোষণা করা উচিত। কমরেড লেনিন তখনও স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন—"When the lefts unit under the peace slogan, this deserved encouragement, provided it was the first step in protest against the chauvinists, in the same fashion as the Gaponade was the Russian workers first timid protest against the czar. But since the lefts are even now confining themselves in the slogan (slogans are the business of intelligent political leaders), they are stoddy lefts, there is consquently not a grain of 'action' in their resolutions and they are consequently a plaything in the hands of Sudekins·········Hindman, Geffers and Hindenburgs.

"Anyone who fails to understand this even today when the peace slogan, unaccompanied by a call for revolutionary mass action has been prostituted by Bernstein, Koutksy & Co is simply an unwritten participant in the social chauvinist humbuging of the people".

মর্মার্থ ঃ "বামপন্থীরা যদি শান্তি আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে তাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, যদি সেই আন্দোলন উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে প্রতিবাদের প্রথম পদক্ষেপ হয়, যেভাবে ফাদার গ্যাপনের নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী জারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের সুর তুলেছিল। কিন্তু যেহেতু বামপন্থীরা এখনও তাদের আন্দোলনকে কেবলমাত্র শ্লোগানেই আবদ্ধ রেখেছে। (বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতাদের কাজই হল একটা করে শ্লোগান দেওয়া) এরা হল নিষ্কর্মা বামপন্থী, তাদের প্রস্তাব সমূহে সংগ্রামের বিন্দুমাত্র কথাও নেই ; ফলে তারা সুদেকিনস······হিণ্ডম্যান, জেফার্স ও হিণ্ডেনবুর্গদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।

"আজকের দিনেও যারা একথা বুঝতে অসমর্থ হয়, বিশেষ করে যখন বিপ্লবী গণ সংগ্রামের আহ্বান হতে বিযুক্ত শান্তির শ্লোগান বার্নস্টাইন-কাউটস্কি প্রমুখরা দিচ্ছে, —তারা সামাজিক উগ্র জাতীয়তাবাদী বুলি কপচানেওয়ালাদের অলিখিত সহযোগীতে পরিণত হয়।"

শুধু তাও নয়, কমরেড লেনিন তথাকথিত শান্তিবাদীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—শান্তিবাদীরা তথাকথিত শান্তি আন্দোলন করতে থাকুক, এবং যত খুসী পায়রা উড়াতে থাকুক, আমরা বিপ্লবী মার্ক্সবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সুযোগে নিজ নিজ দেশে শাসকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব এবং শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনে প্রকৃত শান্তি আনয়ন করব।

(দুই)—দ্বিতীয় বিভ্রান্তির আশঙ্কা এখানে যে, বর্তমান পরিস্থিতি এখনও যেভাবে এগিয়ে চলছে, তাতে সোভিয়েত রাষ্ট্র এবং জনগণতান্ত্রিক চীনসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শিবিরের বিরুদ্ধে সম্মিলিত-ভাবে নিজেরাও নামতে পারেনি ; এমন কি বিশ্বের জনগণকে সে কাজে নেবার জন্য আহ্বান জানানোর সম্ভাবনাও কম। বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী দেশগুলির বিবদমান গোষ্ঠীর কোন গোষ্ঠী সোভিয়েত রাষ্ট্রকে এবং কোন গোষ্ঠী জনগণতান্ত্রিক চীনকে নিজের দিকে টেনে নেবার কাজে সচেষ্ট। সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী বিবদমান দেশগুলির এই কার্যকলাপ যে নিছক সামরিক-কূটনৈতিক রণকৌশলগত (Military Strategic

action) তা ভুলে গেলে, এমন পরিস্থিতিতে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। যারা সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীল, তারা সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী গোষ্ঠীকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য দিয়ে অপর গোষ্ঠীকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে পারে। আবার যারা চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল, তারা চীনের সঙ্গে যুক্ত সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী গোষ্ঠীকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়ে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানাতে পারে। বাস্তরিক এই বিভ্রান্তিজনিত কার্যকলাপই হবে সব চাইতে মারাত্মক। কারণ, পূর্বেই বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদীরা সামরিক কূটনৈতিক ও রণকৌশলগত কারণে সাময়িক ভাবে শ্রেণীশত্রু সমাজবাদী শিবিরের কোন না কোন দেশের সঙ্গে যুক্ত হলেই প্রগতিশীল হয়ে যায় না। যুদ্ধকালীন কার্যোদ্ধারের পরই সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী যে স্বমূর্তি ধারণ করে তা বুঝতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। সুতরাং এই পরিস্থিতি যদি সত্যি সত্যি আসেও, তবুও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের ফলে আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধের যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই থেকে যাবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালে বিশ্ব জনগণের যা করণীয়, তাতে তারা অবশ্যই করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সোভিয়েত রাষ্ট্র ও জনগণতান্ত্রিক চীন ইতিমধ্যে নিজ নিজ দেশে যে সমাজতান্ত্রিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যে অ-ধনতান্ত্রিক (non capitalist) অর্থনীতির ভিত্তিমূল সৃষ্টি করেছে, তাকে রক্ষা করার জন্য সেই সকল দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে যথাসম্ভব সাহায্য করতে হবে। কিন্তু, এটাও মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের জনগণ নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী-ধনবাদী শাসক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেই ঐ সকল দেশকে প্রকৃত সহায়তা দিতে পারে।

রুশ দেশের নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শিক্ষা এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে বিশ্বের জনগণ আজও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকালীন কমরেড লেনিনের সেই ঐতিহাসিক আহ্বান "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর" ও নির্দেশেই সঠিক পথে চলবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিজ নিজ দেশের শাসক শ্রেণীর সমূহ উচ্ছেদ এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত বন্ধ করার একমাত্র সুনিশ্চিত পথ। কমরেড লেনিনের ভাষায়— "War can be resisted only by a revolutionary mass action" (একমাত্র বিপ্লব সফল করেই যুদ্ধ বন্ধ করা যায়)। কারণ সমাজ যতদিন শ্রেণী বিভক্ত থাকবে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ-ধনবাদের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। নভেম্বর বিপ্লবের পটভূমিকায় আজকের দিনে যদি কোন শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়, তা এখানেই নিহিত। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্ত বন্ধ করার জন্য বিশ্বজনগণের সামনে এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের সংগ্রামী নায়ক



সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী সোচ্চার

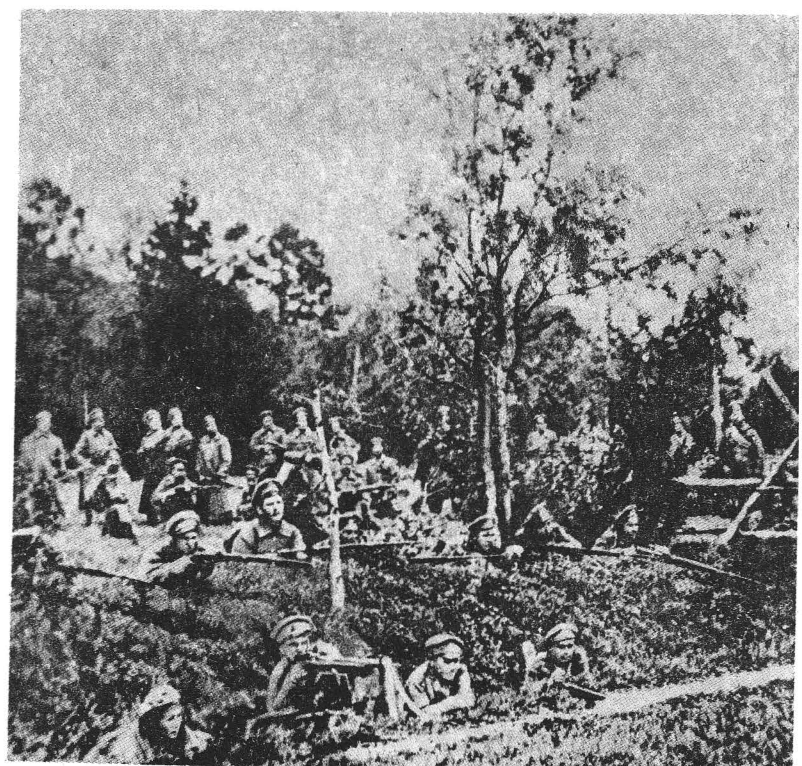
কমল সরকার

যতই দিন যাচ্ছে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। যুদ্ধ বলতে এখানে বোঝায় সাম্রাজ্যবাদের চাপানো প্রভুত্ব বিস্তারের যুদ্ধ। সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণী প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছেন।

এবছর (১৯৮২) সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা ও পশ্চিম বাংলায় এবং অক্টোবর মাসে দিল্লীতে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বড় বড় সমাবেশ ও মিছিল করে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধপ্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর শ্রমিক-কর্মচারীরাই নয়, কৃষক ছাত্র যুব মহিলা তথা সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ, এমনকি লেখক গায়ক অভিনেতা, এককথায়, মুষ্টিমেয় মানুষ ছাড়া প্রায় সকল স্তরের নরনারী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি এই যুদ্ধবাজদের বেরুটে অনুষ্ঠিত নৃশংসতায় পৃথিবীর মানুষ শিহরিত হয়েছে। পশ্চিম বেরুটে অবস্থিত ফিলিস্টিনদের দুটি উদ্বাস্তু শিবিরে ইজরাইল সেনাবাহিনী ও খৃস্টান ফ্যালনজিস্টরা ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে নিরস্ত্র লেবাননবাসী দেড় হাজারের বেশী নরনারী শিশুর নরমেধ যজ্ঞে যে রক্তনদী প্রবাহিত করেছে তা নিন্দার কোন উপযুক্ত ভাষা অভিধানে নেই। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ৪০ বছর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী নুরেমবার্গ ও জার্মানীর বন্দী শিবিরগুলিতে গ্যাসচেম্বারে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে যে বীভৎস নজীর সৃষ্টি করেছিল কেবল তার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। আমেরিকা সহ যে সমস্ত যুদ্ধবাজরা ইজরাইলকে যুদ্ধের উস্কানীতে প্রতিনিয়ত সমর্থন জানিয়ে আসছে এবং যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে তারা এবং বিশেষ করে মাকিন সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। আজ বিশ্ববাসীর সঙ্গে ভারতের মানুষও দলমত নির্বিশেষে এই যুদ্ধবাজদের নিন্দা করছে। পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে ইজরাইলের কাপুরুষোচিত কাজের নিন্দা করেছে।

মাকিন সাম্রাজ্যবাদ যতই নির্লজ্জভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে জড়িয়ে পড়ছে তত বেশী করে যুদ্ধের আশঙ্কা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করছে। অনেকেই বলেন এই সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী শ্রমিক আন্দোলনে কোন স্পন্দন জাগায় না। তাঁরা-



সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক : শিল্পী কুজ নেত্সভ্

বলেন, শ্রমিক আন্দোলনের এটা একটা বড় দুর্বলতা। অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও আন্দোলনে যত সহজে শ্রমিকশ্রেণীকে সমবেত করা যায় তা কিন্তু রাজনৈতিক সংগ্রামের মঞ্চে পারা যায় না। অভিযোগটা একটু খুটিয়ে বিচার করা দরকার। অভিযোগটা হচ্ছে বিশেষভাবে অ-বাঙ্গালী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। যে সমস্ত অবাঙ্গালী শ্রমিক অতি সহজেই অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের লড়াই এ স্বতস্ফূর্তভাবে হাজির হন তাঁরা ভোটের সময় আমাদের সঙ্গে থাকেন না বা ভোট দেন না বলে যা বলা হয় তা আংশিক সত্য। কী বাঙ্গালী কী অবাঙ্গালী শ্রমিক সাধারণ বহু সংগ্রামের মধ্যে বুঝেছেন যে কার হাতে অর্থাৎ কোন পার্টির হাতে সরকার থাকবে তার ওপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করবে' তার অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাফল্য বা ব্যর্থতা। ১৯৫২ থেকে ১৯৮২ সালের ভোট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সংগঠিত শ্রমিক অঞ্চলে কায়েমী স্বার্থকে ক্রমে ক্রমে বামপন্থীদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হচ্ছে। আজ গঠিত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। আজকের এই জয়ের পেছনে শ্রমিক আন্দোলনের একটা লম্বা ইতিহাস আছে। আর শুধু শ্রমিকরা নয় মানুষের অন্যান্য অংশ এই সরকার গঠনে অংশীদার।

ভারতবর্ষ দুই শতাব্দী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত ও পরাধীন থাকার সময় ভারতবাসীর মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের জোয়ার এসেছিল শ্রমিকশ্রেণী তার থেকে বাইরে ছিল না। কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে যে মডারেট দল ডোমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে হৈ চৈ করেছিল তাদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ ছিল। তারাই অর্থাৎ এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই পরবর্তীকালে গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলনের পাশাপাশি মধ্যবিত্তের বিপ্লব বা টেররিজম, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল এবং আজাদ হিন্দ আই এন এ' তে রূপ পরিগ্রহ করে।

ভারতে যুদ্ধ-বিরোধী প্রথম ধর্মঘট

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ-বিরোধী প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট বোম্বাই' এ যে শ্রমিকেরা করেছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক চেতনার প্রথম স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল ১৯০৮ সালের তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ মিছিলে ও ৮ দিনের রাস্তা অবরোধ ও ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা যুদ্ধ-বিরোধী কোন শব্দ উচ্চারণ করেননি। গান্ধীজী স্বয়ং সেবার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমর্থন করেছেন। তখনকার জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের কাছে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের যে গল্প বৃটিশ সরকার করেছিলেন তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের স্মরণে উদয় হয়নি।

এই দুই বিশ্বযুদ্ধ কালের মধ্যবর্তী সময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে ও ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের চেতনায় এই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা আসতে সময় লেগেছিল।

১ সেপ্টেম্বর

যুদ্ধ শুরু হল ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর। হিটলার অনেকের অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে পোলাণ্ড আক্রমণ করে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু করল। বৃটিশ সরকার হিটলারকে তোয়াজ করে একের পর এক দেশ বলি দিচ্ছিল এই আশায় যে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবে। তা ঘটেছিল তিন বছর পরে। হিটলারের নাৎসী বাহিনীর আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে ইংলণ্ড ৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ভারতের বড়লাট হিটলারের বিরুদ্ধে ভারতকে জড়িয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অর্ডিন্যান্স জারী করলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ভারতের প্রগতিশীল শক্তি অনেক বেশী সংহত। কংগ্রেসও পূর্ব ধারণার দ্বারা চলতে রাজী নয়। দেশের স্বাধীনতা বা স্বাধিকারের প্রশ্নে ক্ষমতা কতখানি হস্তান্তর করবে তা আগে থেকেই পরিষ্কার করতে চেয়েছিল। সুভাষ বোস রামগড়ে সমঝোতাবিরোধী সম্মেলন করে যুদ্ধের সুযোগে স্বাধীনতার লড়াইকে জোরাল করতে চেয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে স্বাধীনতার সংগ্রামকে তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

২২ জুন

১৯৪২ সালের ২২ জুন হিটলারের নাৎসী বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টরা যুদ্ধের চরিত্র বদলে গেছে বলে ঘোষণা করেন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধের রূপ নিল। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতবাসীর বৃটিশবিরোধী মেজাজ তখনো বৃটিশ সরকার সম্যক উপলব্ধি করতে পারে নি।

যুদ্ধবিরোধী প্রথম ধর্মঘট

ভারতবর্ষে তৎকালীন যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ১৯৩৯ সালে ২ অক্টোবর যুদ্ধবিরোধী প্রথম রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট হয়। বোম্বাই-এর ৯০ হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিলেন। রজনীপাম দত্ত তাঁর 'ইণ্ডিয়া টু-ডে' পুস্তকে বলেন যে তখন পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন দেশ কোন যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘট করেন নি। এ বিষয়ে ভারতই প্রথম। যুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক ধর্মঘট করা সত্ত্বেও ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ ঘটেছিল আরো পরে। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের

উত্তাল তরঙ্গাঘাতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক ভিত্তি সেদিন টলমল করে কেঁপে উঠেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির মধ্যে বৃটিশ ও মার্কিন সরকার একত্রে অবস্থান করলেও তাদের সর্ববিষয়ে অমিল ছিল। ১৯৪১ সালে রুজভেল্ট যখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় সনদে ঘোষণা করল যে যুদ্ধ শেষে প্রতিটি দেশ স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে নিজ নিজ দেশে সরকার গঠন করতে পারবে, তার বিরোধিতা করে চার্চিল।

১৯৪২ সালের জুন মাসে জার্মানি সোভিয়েৎ ইউনিয়ন আক্রমণ করলে রাশিয়া আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে সরাসরি শামিল হয়। হিটলারের নাৎসী বাহিনী যতই দুর্ধর্ষ হোক না কেন তার পতন শুরু হল সেই ২২ জুন থেকেই। পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাজিত করার সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। সেদিনের স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ এবং অবরোধের মধ্যে থেকে লেনিনগ্রাদের যুদ্ধে যা অপূর্ব বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অমর কাহিনী হয়ে রয়েছে। নেপলিয়ানের মত হিটলারকে পিছু হটতে হল, পরাজিত ও বিধ্বস্ত হতে হল। আর সাম্রাজ্যবাদকে সার্বিকভাবে পিছু হটতে হল। ঔপনিবেশিকবাদের অবসানের যুগ শুরু হল।

১৯৪২ সালে রুজভেল্টের ঘোষণায় চার্চিল চটলেও তা মেনে নিতে হয় ৪ বছর পরে। যুদ্ধ শেষ হল ১৯৪৫ সালে। ভারতের সর্বস্তরের মানুষ উত্তাল। আন্দামানে রয়েছে বিপ্লবী বন্দীরা, আজাদ হিন্দ ফৌজের আই-এন-এ বন্দীদের একটা বড় অংশকে দেশের জেলখানায় নিয়ে এসে বৃটিশ সরকার বিচার শুরু করে দিয়েছে। দেশের সর্বত্র বন্দী মুক্তি আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ হয়ে দাঁড়ালো। এই সময়েই রেলের শ্রমিকেরা সূতাকল শ্রমিকেরা এবং চটকল লোহা কারখানার শ্রমিকেরা নানা দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন।

বিদ্রোহ, দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ

তখন সালটা ছিল ১৯৪৬ সাল। বোম্বাই-এর নৌসেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। কলকাতা সহ শহর ও গ্রাম বন্দরে ডাক ও তার কর্মচারিরা ধর্মঘট করে রয়েছেন। তাদের সমর্থনে ২৯ জুলাই সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট হল। বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে এই ধর্মঘট স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কলকারখানা তো বটেই ট্রেন ট্রাম বাস ট্যাক্সি এবং রেডিও স্টেশন কর্মচারিরা পর্যন্ত ধর্মঘট করলেন। আগেই বলেছি বন্দী মুক্তি আন্দোলনের কথা। তখন লীগ গভর্ণমেন্ট চলছে। এসেম্বলী অভিযান বলতে এসেম্বলীর চত্বরে ঢুকে হাজার হাজার মানুষ আওয়াজ দিচ্ছে। বড় বড় শ্রমিক সমাবেশ কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ সর্বত্র বৃটিশ রাজ-পুরুষদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছে। ইংরেজ শাসনের অবসানের দিন আসন্ন। কলকাতার রসিদ আলি দিবসে হিন্দু মুসলমানের মিলিত মিছিল দেখে এই শহরেই দাঙ্গার বিভীষিকা আসছে তা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ দিনগুলিতে ঘন ঘন পট পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন নাটককেও হার মানায়। ভারতে যুদ্ধ না হলেও ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বাংলার সন ১২৭০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরকে হার মানিয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটিশ রাজপুরুষেরা এখানকার খাদ্য বস্ত্র ফ্রন্টে যুদ্ধের সৈনিকদের চালান দেবার ফলে এখানে দুর্ভিক্ষ। বাংলাকে এর খেসারত দিতে হোল। ১৯৪৩ সালের সেই মহাদুর্ভিক্ষে অর্ধ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যু বরণ করেছে।

যুদ্ধের বিভীষিকা, দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা মানুষকে মরীয়া করে তুলেছিল, সেই জঙ্গী মনোভাব স্বাধীনতা আন্দোলনেও জঙ্গীরূপ নিয়ে এসেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ তৎকালীন বৃটিশ শাসকদের ভীত করে তুলেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল।

এই সময়টা বুঝতে হলে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীর ভূমিকা বুঝতে হবে। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারির দিনগুলিকে মনে রাখতে হবে। বোম্বাই এর নৌবিদ্রোহে ৪৫টি জাহাজ, ১১টি ছোট জাহাজ, ৪টি ফ্লে টিলার নাবিকরা তাদের জাহাজ ও অস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহ করে। রাশিয়ার বিপ্লবে আরোরার কথা স্মরণীয়। তেমনি ভারতের এই নৌ বিদ্রোহ সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে অনন্যপূর্ব। বিদ্রোহী নাবিকরা ৭ ঘন্টাব্যাপী বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে। জাহাজে স্বাধীন ভারতের পতাকা হিসাবে ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে কংগ্রেস লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উত্তোলন করে। বোম্বাই এর রাজপথে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করে। এই বিদ্রোহের সমর্থনে মারাঠা রেজিমেন্ট, বিমান বাহিনী ও বিমান কর্মচারিরা ও বহু স্থানে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণী ও ছাত্ররা রাস্তায় নেমে পড়েন। ১৯৪২ এর কুইট ইণ্ডিয়া এবং তার আগে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভয় পায় নি। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণ, আজাদ হিন্দ ফৌজের ঘটনাবলী, নৌ বিদ্রোহ ও রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা স্বাধীনতা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

ফ্যাসিবিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানবজাতির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে হলে এবং

আজকের পরিস্থিতিতে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে তা বুঝতে হলে তখনকার ঘটনাবলীর পর্যালোচনা দরকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর এবং সেকারণেই ঐ তারিখকে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন যুদ্ধবিরোধী দিবস হিসাবে পালনের আহ্বান জানিয়েছে। এই দিবস পালনের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী সোচ্চার হয়েছে—তারা বলছে আর যুদ্ধ নয়, আর নয় ১ সেপ্টেম্বর। এবছর এই দিবস পালনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী তার সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে।

১ অগাস্ট

আরে একটু পেছন ফিরে তাকানো যাক। ১৯২৯ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশনে ১ অগাস্ট যুদ্ধবিরোধী দিবস পালনের ঘোষণা করা হয়েছিল। পৃথিবী জুরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যে প্রস্তুতি তখন চলছিল তখন চলছিল তার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদ ১ অগাস্ট সভা সমাবেশের মধ্যে জানানো হয়েছিল। ফ্যাসিজমের বিপদ বাড়ছে এই উপলব্ধি ক্রমেই যত বেশী বেশী অনুভূত হচ্ছে ততই তার বিরুদ্ধে ব্যাপক সমাবেশের প্রয়োজনবোধও বাড়ছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ১ অগাস্ট পালনের এই আহ্বান তখন বেশী সাড়া পাওয়া যায়নি। ১৯৩৫ সালে আন্তর্জাতিকের ৭ম কংগ্রেসের অধিবেশনে জর্জি ডিমিট্রভের ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে সকলকে ব্যাপকতর মঞ্চে সমবেত করার আহ্বানে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়।

এই সময় আমরা ভারতবর্ষেও যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলুম। ১ অগাস্ট উপলক্ষ করে পার্টি পত্রিকা "মার্কসবাদী" এবং লেবার পার্টির সংগে যুক্ত কর্মীরা "ছাত্র-দল" পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। এই সময়েই অক্টারলনি মনুমেন্ট ময়দানে একটি যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ হয়। এখানে বক্তৃতা করার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে আবদুল হালিম সামসুল হুদা এবং আরো কয়েকজনের জেল হয়। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সময় যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের ব্যয়ের বদলে যদি মানুষের উন্নতিতে সেই অর্থ ব্যয় হতে পারত তাহলে পৃথিবীর রূপান্তর সম্ভব হত। তখন আমাদের দেশ ছিল পরাধীন, বেকারী ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে হতমান। যুদ্ধ যেহেতু ইংরাজ সরকারের স্বার্থে পরিচালিত তাই যে কোন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন মানুষকে উৎসাহিত করে। রাজনৈতিকভাবে এই যুদ্ধের বিরোধিতার মধ্যে ইংরাজ রাজত্বের বিরোধিতায় দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ উদ্দীপ্ত হন। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিপদে আমাদের মুক্তি ত্বরান্বিত হবে এই ধারণার দ্বারা



বিপ্লবী সৈনিক দেশরক্ষায় প্রস্তুত

আমরা স্বাধীন দেশের মানুষেরা উৎসাহিত হই। যুদ্ধের বিরোধিতায় স্বাধীনতাকামী মানুষ আন্দোলন করলে তখন তাদের জেলে পোরা হত। সেইটাই ছিল রীতি।

১৯৪২ সাল

এই গণ-জাগরণের জোয়ারের মধ্যেই ১৯৪২ 'এর অগাস্ট আন্দোলন, সুভাষ বোসের বার্লিন টোকিও ও সেখান থেকে রেঙ্গুন যাত্রার সংবাদ আন্দোলনের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হবে সে হিসাবেই এদেশের জাতীয়তাবাদী মানুষ নিয়েছিলেন। অপর দিকে ১৯৪২ সালের ২১ জুন যখন হিটলারের নাৎসী বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করল এবং কমিউনিস্টরা যুদ্ধের চরিত্র বদলেছে বলে জনযুদ্ধের পক্ষে প্রচারে নামলেন তখন তা আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের বড় অংশ বুঝতে পারলেন না।

ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এদেশের কমিউনিস্টরা যারা ১৯২১ সাল থেকে একটানা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রধান শক্তি তাঁদের বক্তব্য বুঝতে না পেরে এবং কংগ্রেস ইচ্ছা করেই যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল তা কাটতে অনেক সময় লেগেছে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই ফ্যাসিস্ট দানবীয় শক্তিকে পরাজিত করার জন্য ব্যাপক

ঐক্যের যে আহ্বান কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৭ম কংগ্রেস দিয়েছিল তারই পরিণামে ফ্যাসিস্ট শক্তিই শুধু পরাভূত হল তাই নয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটির পর একটি দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীন হোল। এই অবস্থা পরিবর্তনের মূলে ছিল সেদিনের জনযুদ্ধের ভূমিকা। কোটি কোটি মানুষের মৃত্যুর মূল্যে সেদিন পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। লেনিনগ্রাদের অবরোধের মধ্যে বাস করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং বিশেষ করে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয় তা আজ সর্বজন স্বীকৃত।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ক্যাভাল্রি বা অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরাই যুদ্ধে মূল বোঝাটা বহন করেছে, সম্মুখ সারিতে দাঁড়িয়ে লড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এলো বিমান ও বিমান যুদ্ধ। এই বিমানের ব্যবহার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে হতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগে এল হিরশিমা নাগাসাকির আণবিক যুদ্ধ, এটম হাইড্রোজেন বোমা সেদিনের যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে এসেছিল আর পরবর্তি কালে সেই এটম যুদ্ধেই হতে চলেছে যুদ্ধের প্রধান ঘটনা। আমেরিকা পৃথিবীর অধিবাসীদের নিঃশেষ করে দেবার ভয় দেখাচ্ছে।

রেগান আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হওয়ায় পর থেকেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে পুঁজিবাদের ক্রমবর্দ্ধমান সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের চাকা হাস্যকরভাবে পিছনে টানার চেষ্টা করছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর ভূখণ্ড পুর্নবন্টন প্রশ্নটি মূল প্রশ্ন ছিল জার্মানীতে ফ্যাসিজমের অভ্যুদয়ে হিটলারের প্রধান শ্লোগান ছিল ঃ ভার্সাই চুক্তি বাতিল কর, বেকারদের চাকরি দাও! এই শ্লোগানের আড়ালে হিটলার চাইছিল যুদ্ধের প্রস্তুতি। যুদ্ধের আওয়াজ তুলে দেশকে সেনাবাহিনীর ব্যারাকে পরিণত করে জার্মানী হিটলারী শাসনে ইউরোপকে তাঁর বশ্যতায় নিয়ে আসতে চাইছিল। এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুত্যত পর্বে আমেরিকার পুঁজিবাদের মুখপাত্র রেগন প্রশাসন যুদ্ধের দ্বারা গোটা পৃথিবীটাই দখলে আনতে চায়। বিশ্বশান্তির প্রধান শত্রু এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির যে সম্পদ আছে তা মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহৃত না হয়ে ধ্বংসের জন্য কাজ করছে। ধ্বংসের মহাযজ্ঞে আমেরিকা যে কর্মসূচী নিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে লক্ষ কোটি ডলার নিয়োজিত যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধকে ছড়িয়ে দেবার জন্য ৬ কোটি মানুষ নিযুক্ত রয়েছে। যখন এইভাবে বিপুল অর্থ ও উদ্যোগের অপব্যবহার হচ্ছে তখন প্রতি তিনজনের একজন চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে অথবা অসুখে ভূগছে, যখন প্রতি ৫ জনের একজন নিরক্ষর, যখন প্রতি ৬ জনের একজন পুষ্টির অভাবে পীড়িত, যখন প্রতিবছর পৃথিবীর ৫ কোটি মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় অনাহারে মরছে, যখন আরো শত সহস্র মানুষ বেকার হয়ে পথে পথে ঘুরছে এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি দীর্ঘস্থায়ী সংকট ও মুদ্রাস্ফীতিতে ধুঁকছে এই যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ও যুদ্ধ প্রস্তুতিতে মুনাফা লুটছে বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। লোকসানের কোন ঝুঁকি না মার্কিন পুঁজিপতিরা দেশে ও বিদেশে যে ব্যবসা করছে তার পরিণাম ভয়াবহ।

রেগন প্রশাসন সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ও মারাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছে। এই কাজ যেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন তেমনি মানবতা বিবর্জিত। মানুষ ধ্বংসকারী এই বিধ্বংসী বোমা নিউট্রন এবং এম এক্স মিশাইল প্রস্তুত ও মজুদ করার সিদ্ধান্তের মধ্যে ভবিষ্যতের বিপদ লুকিয়ে রয়েছে। এই অস্ত্রগুলি যেখানে ফেলা হবে তা সেখানকারে বাড়িঘর প্রভৃতি অক্ষত রেখে সর্বপ্রকার জীবন স্পন্দনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে। আমেরিকা সাহায্যদানের নামে যে সমস্ত ঋণ "দান" করছে তার মধ্যেই অস্ত্র আমেরিকা থেকে কেনার ও যুদ্ধঘাঁটি করার সর্ত রয়েছে। যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে মানুষের কল্যাণকর উৎপাদন হয় না তার দ্বারা হয় ধ্বংস, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে। বাড়ে দুঃখ দারিদ্র। রুদ্ধ হয় পৃথিবীর অগ্রগতি।

পারমাণবিক যুদ্ধ নিয়ে আসবে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংস একথা সত্য হলেও এটাই শেষ কথা নয়।

শ্রমিক শ্রেণী আজ সোচ্চার

১৯৩০-৪০ সালের তুলনায় বর্তমান পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণী এবং সমগ্র জনগণের এক বড় অংশ অনেক বেশী সক্রিয়। যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন জনমতের উত্তাল প্রকাশ। খোদ আমেরিকার নিউইয়ার্ক শহরে ৮০ লক্ষ মানুষের যুদ্ধবিরোধী মিছিল বলেছে, "যুদ্ধ থামাও" বলেছে "যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।" আমেরিকার ক্রীড়াপুত্তলী ইজারাইলে পর্যন্ত যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ থেকে বেরুটে ইসরাইল যে প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তু শিবিরে ধ্বংস ও হত্যা সংগঠিত করেছে তার বিরুদ্ধে ধিক্কার দিয়েছে। লণ্ডন প্যারিস টোকিউ রোম সর্বত্র এই যুদ্ধবিরোধী মিছিল আজ সোচ্চার। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ বড় বড় সমাবেশ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ধিক্কার দিচ্ছে।

আজ ভারতবর্ষও সোচ্চার। সোচ্চার গোটা পৃথিবী। ১লা সেপ্টেম্বরের পর কলকাতার বুকে ২৩ সেপ্টেম্বর ৫ লাখ মানুষের যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তা যেমন অভূতপূর্ব তেমনি দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কলকাতার এই মিছিলের

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহু পেশার মানুষ নিজ নিজ পেশার প্রতীক নিয়ে উপস্থিত। গায়ক লেখক শিল্পীরা এসেছেন গান করতে করতে, নাটকের দৃশ্য অভিনয় করতে করতে, আইনজীবীরা কালো কোট গায়ে দিয়ে, নার্সরা এসেছেন ইউনিফর্ম পরে, তেমনি ফায়ার ব্রিগেড ও অন্যান্য পেশার শ্রমজীবী মানুষ, স্টেট বাস ট্রামের শ্রমিকেরা মিলিটারী কায়দায় ফায়ার ব্রিগেডের পাশে পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে গেছেন। আর কলকাতার সব দিক থেকে এসেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ, ব্যারাকপুরের শ্রমিক এলাকাগুলি খালি করে কলকারখানার মজুরেরা; আসানসোলের কয়লাখনি, দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার শ্রমিকেরা। হুগলী হাওড়া, ২৪ পরগণার চটকল সূতাকল ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকেরা।

এই মিছিলে এসেছেন ছাত্রছাত্রী। যুবকযুবতী স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষ লক্ষ লক্ষ মানুষ। এতবড় মিছিল এমন বর্ণাঢ্য মিছিল কলকাতায় এর আগে আর কখনো হয় নি।

সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ঘোষণা করেছে তারা প্রথম আণবিক বোমা ব্যবহার করবে না। আমেরিকা এই রকম কোন ঘোষণা করতে অস্বীকার করছে। পরন্তু তারা নিউট্রন বোমার স্টক বাড়িয়ে চলেছে। আমেরিকা চায় পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে। একদা সিনেমার পর্দায় রাখাল ছেলের ভূমিকায় অবতীর্ণ বালক রেগন এখন পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী দেশ আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে পৃথিবী ধ্বংসের কাজে ব্রতী হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে হিটলারের দোসররা দেশে দেশে যুদ্ধ লাগাত। ইতালির মুসলিনী আবিসিনিয়া দখল করে, স্পেনের ফ্রাঙ্কো গৃহযুদ্ধের মধ্যে গণতন্ত্র ধ্বংস করে স্পেন অধিকার করে বড় যুদ্ধের মহড়া নেয়। বৃটেন একের পর একটি দেশ হিটলারকে উপহার দিতে চেয়েছিল। আজও সেইভাবে আমেরিকা পৃথিবীর বহু দেশে যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি করছে। ভারত মহাসাগরে দিয়াগো গাসিয়ায় যুদ্ধ ঘাঁটি করে যুদ্ধের বিপদ ভারতের নিকটবর্তি করে আনল।

ভারতবর্ষ এই মানবতাবিরোধী যুদ্ধ বন্ধ করতে চায়। দল মত নির্বিশেষে শান্তির জন্য মানুষের জীবনপণ সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পাশে পুঁজিবাদী ও বিকাশশীল দেশের মানুষ এক মহামিছিলে এসে জড় হয়েছে। যুদ্ধবিরোধী এই আন্দোলনকে ব্যাপক ও বৃহত্তর করার মহান কর্তব্য শ্রমিকশ্রেণীর।

মস্কোর রেড স্কোয়ারে বিপ্লবী লেনিনের সমাধিক্ষেত্র



সমকালীন ভারতীয় মধ্যবিত্তের ওপর নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব

শুভাশীষ গুপ্ত

রুশ দেশে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পর ৬৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বিপ্লব হ'ল সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনাগুলির অন্যতম প্রধান। বিপ্লব মুহূর্ত থেকে অদ্যাবধি এটির মর্ম সারা পৃথিবী-ব্যাপী অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে চলেছে। এই বিপ্লবের ফলাফল বর্তমান বিশ্বের ও বিশ্ব সমাজব্যবস্থার অগ্রগতির ও অবধারিত পরিণতির পক্ষে, প্রধান কারক শক্তি হিসাবে এখনও পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়। ভারতেও প্রথমাবধি নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব পড়েছে। সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে তা' উত্তরোত্তর বেড়েও চলেছে। কেননা স্ট্যালিনের ভাষায় এই "বিপ্লবকে একটি দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ মনে করা যায় না। মূলতঃ এটি আন্তর্জাতিক বিপ্লব। কারণ, এই বিপ্লব মানব সমাজের ইতিহাসে একটি মূলগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই বিপ্লব পুরানো ধন-তান্ত্রিক জগৎকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় পরিবর্তিত করেছে।"

(দুই)

নভেম্বর বিপ্লবের কালে ভারতবর্ষ সর্বাংশেই একটি পরাধীন দেশ ছিল। এই বিপ্লব যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুসংকেত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, তাই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকরা প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছে এই বিপ্লব সম্পর্কিত সমস্ত সংবাদ ও তার সাফল্যগুলিকে এদেশের মানুষের কাছে যথাসাধ্য গোপন রাখতে। সংবাদ আদান-প্রদানের সমস্ত ব্যবস্থার উপর কঠোর খবরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে, ১৯১৭ সালে অনুষ্ঠিত বিপ্লব সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানা ও সে বিষয়ে মনোভাব গঠন ও তা' প্রকাশ করতে এদেশের মানুষের আরও বছর তিনেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা সত্য যে ঐ বিপ্লবের সাথে ভারতবর্ষের কিছু কিছু মানুষের একেবারে প্রত্যক্ষ যোগা-যোগও ঘটেছিল। সেই যোগাযোগ ক্রমশঃ নিবিড় হয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লব-প্রভাব ক্রমশঃ প্রসারিতও হয়েছে।

(তিন)

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সেই উপনি-বেশবাদী কাল-পর্বে অন্যান্য পরাধীন দেশগুলির মত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের স্বার্থও ঐতিহাসিক-ভাবেই জড়িত ছিল রুশ বিপ্লবের ফলাফলের মধ্যে। কেননা পরাধীন জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের বিষয়টি ছিল সংশ্লিষ্ট দেশ-গুলির সমাজ অগ্রগতির একটি অন্তবর্তী স্তর। এর পরিপূর্ণ ভবিষ্যত নিহিত ছিল সামাজিক সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত এক মানব সমাজের মধ্যে—করে প্রথম সাফল্য এসেছিল রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। উন্নত ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে সমাজ পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব হল এক অপরিহার্য শর্ত। বুর্জোয়ারা সেখানে শ্রেণীশত্রু—প্রতিবিপ্লবী। কিন্তু পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়ারাও, সাধারণভাবে, অংশীদার হয়েছে। এশিয় ভূখণ্ডের এই বাস্তবতা লেনিন তখনই লক্ষ্য করেছিলেন এবং যে কারণে তিনি বলেছিলেন "এই সব জাতির মধ্যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হচ্ছে। একে জাগ্রত হতেই হবে। এর ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা রয়েছে।" নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়ারা নিপীড়ক



সোভিয়েতগুলির নিখিল রুশ দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন : শিল্পী সেরোভ্

জাতির বুর্জোয়াদের থেকে স্বতন্ত্র। শেষোক্তরা প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের একটা স্তর পর্যন্ত প্রথমোক্তরা প্রগতিশীল। একইভাবে এটা সত্য মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রেও। তাই দেখা যায় যে জাতীয় মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে গিয়ে অন্যান্য শ্রেণীগুলির সাথে ভারতের মধ্যবিত্ত-সমাজ-সংশ্লিষ্ট কিছু-মানুষ রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। একটা ভাল অংশ তখনই নানান ভাবে প্রভাবিতও হয়েছিলেন। সংগে সংগে একথাও সত্য যে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সমাজতান্ত্রিক দর্শনকে প্রথম বহন করে এনেছিলেন যাঁরা তাঁরা ছিলেন প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু ধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। তাঁরা এর রসদ সংগ্রহ করেছিলেন প্রথমত ও প্রধানত: নভেম্বর রুশ বিপ্লব থেকেই। এই ঘটনাটি একটা সমাজ বিজ্ঞানের নিয়মেরই পরিণতি; লেনিন দেখিয়েছেন "এই চেতনা (সমাজতান্ত্রিক চেতনা—লেখক) তাদের (শ্রমিকদের—লেখক) কাছে আনা যায় বাইরের থেকে। সমস্ত দেশেরই ইতিহাসে দেখা যায় যে একমাত্র নিজের চেষ্টায় শ্রমিকশ্রেণী শুধু ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার বিকাশেই সক্ষম।......কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্ব সম্পত্তিশালী শ্রেণীর প্রতিনিধি বুদ্ধিজীবীদের দার্শনিক, ঐতিহাসিক আর অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে।..."

(চার)

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্গাতা দার্শনিকদ্বয়-মার্কস-এঙ্গেলস, ভারতকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের রচনাতে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে। তাঁরা "ভারতে ব্রিটেনের সমগ্র শাসনটি পাশবিক" আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন যে এটা ".. হিন্দুস্থানকে আগে যেরূপ দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে তার থেকে মূলগতভাবে পৃথক ও সীমাহীনভাবে অধিকতর তীব্র ধরনের।" ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ ও তার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিভিন্ন সংগ্রামগুলিকেও তাঁরা উভয়েই চমৎকারভাবে মূল্যায়ণ করেছিলেন। ভারতীয় সংগ্রামের প্রথম লক্ষ্য হিসাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও কৃষক সমাজের বন্ধন মুক্তির বিষয়টির ওপর তাঁরা জোর দিয়েছিলেন। কাউৎস্কির কাছে লিখিত পত্রে এঙ্গেলস ভারতের মুক্তি সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছুবে বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইংরেজদের প্রয়াসে সৃষ্ট ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্তদের অভ্যুদয়ের বিষয়টিও মার্কসের নজর এড়িয়ে যায়নি। পরবর্তী শতাব্দীতে রুশ বিপ্লবের স্রষ্টা লেনিনও ১৯১৭-এর নভেম্বর বিপ্লবের বহু আগে থেকেই ভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে দৃষ্টি রেখেছেন এবং সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করেছেন।

এই ভাবে নভেম্বর বিপ্লবের বহু পূর্ব থেকেই বিপ্লবের দ্রষ্টা ও রূপকারদের দৃষ্টির পরিধিতে এসেছে ভারত ও তার জনগণ। বিপরীত পক্ষে, ভারতের মুক্তি প্রয়াসীদের দিক থেকেও তদানীন্তন এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। মুক্তি সাধকদের কোন কোন অংশ ইউরোপের নব উদ্ভূত সমাজ-তন্ত্রের দার্শনিকতার পরিমণ্ডলে বহু আগেই বিচরণ করতে শুরু করেছিলেন। এর অনেকটাই শুরু হয়েছিল মার্কস-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শন প্রতিষ্ঠারও বহু পূর্বে।

(পাঁচ)

ভারতীয় উদীয়মান বুর্জোয়া ও মধ্য-শ্রেণীকে ইউরোপীয় উদারনীতিবাদী ভাবধারার একান্ত অনুগামী বলে বলা হয়ে থাকে। এটা সর্বাংশে সত্য নয়। সাম্প্রতিক গবেষণাগুলি এই প্রসঙ্গে নতুন নতুন ঘটনার প্রতি আলোকপাত করেছে। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের একটা বিশিষ্ট অংশের সমাজতন্ত্রের প্রতি দীর্ঘ আকর্ষণ এবং রুশ বিপ্লবের সাথে তাঁদের একাংশের সম্পর্ক এই নতুন উপাদানকে হাজির করেছে। তবে এটা ঠিক যে দেশের সমগ্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সামগ্রিক বিচারে, তা' ছিল একটা অপ্রধান ধারা।

পরাধীনতা থেকে ভারতের মুক্তির স্বপ্ন ও সাধনার ইতিহাস দীর্ঘকালের। দৃষ্টিভঙ্গীর অস্পষ্টতার জন্য মুক্তির প্রকৃত লক্ষ্য তাঁদের অনেকেরই হয়ত প্রথম থেকে সুনির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার প্রথম প্রহরে দেশের অভ্যন্তরে তেমন কোন ইঙ্গিত না থাকায়, মুক্তি-কামীদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে প্রথমাবধি দেশের বাইরেও ব্যাপকভাবে দিতে হয়েছে। মুক্তির জন্য মানস ও বাস্তব জগতে বিচরণের ক্ষেত্রে সে যুগের অগ্রদূতরা ছিলেন উদীয়মান বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্তরাই। আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৬-৮২) ও ফরাসী বিপ্লবের (১৮৮৯) প্রসঙ্গ তাই এত শ্রদ্ধার সাথে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই ভারতের নবউদিত বুদ্ধিজীবীমহলে আলোচিত হতে দেখা যায়।

প্রসঙ্গতঃ আরও একটি উপাদান লক্ষ্যনীয়। তাহল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে তদানীন্তন সময়ে উদ্ভূত 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আকর্ষণ বৃদ্ধি। এই সমস্ত বিষয়গুলি প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে যে ঐতিহাসিক চরিত্রটি সামনে আসেন তিনি রামমোহন রায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের বিপ্লবগুলির প্রতি তাঁর মমত্ব ও শ্রদ্ধা সর্বজন বিদিত। ১৮৩২-৩৩ সাল বিলেতে অবস্থান কালে তাঁর সাথে, তদানীন্তন সময়ের সুপরিচিত সমাজতন্ত্রী রবার্ট ওয়েনের পরিচয় ঘটেছিল। প্রাক্-মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে এঙ্গেলস্ যাঁকে কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্র বলেছিলেন—সেই ক্ষেত্রের দার্শনিকদের অন্যতম ছিলেন রবার্ট ওয়েন। ওয়েনের পুত্রের সাথে রামমোহন রায় তাঁর পিতার সমাজতান্ত্রিক দর্শন নিয়ে পত্রালাপও করেছিলেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পর ডিরোজিও-পন্থী 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীর পত্রিকা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' ১৮৪২ সালে বিলেতের চারটিস্ট আন্দোলনের প্রতি দ্বারকানাথ ঠাকুর লিখিত সহানুভূতি সূচক পত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সিপাহী বিদ্রোহেরও আগে, ১৮৪৫ সালে কৈলাশ চন্দ্র দত্তর 'ক্যালকাট্টা লিটারারী গেজেটে' ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের দ্বারা শতবর্ষ পরের এক কাল্পনিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিবরণ ছাপা হয়েছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য যে ১৮৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষাতে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ What is the aim of Communism ? Describe the schemes propounded by Fourier and St. Simon respectively. মার্কস প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ওয়াকিং মেনস্ এসোসিয়েশন' বা প্রথম আন্তর্জাতিকের ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত একটি সভাতে কলকাতা থেকে লিখিত একটি পত্রে সেখানে শাখা খুলবার জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। যে সভাতে এই পত্রটি পেশ করা হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন কার্ল মার্কস স্বয়ং। কে এই পত্র লেখক তা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের সংবাদ শিশির কুমার ঘোষের অমৃত বাজারে-এ প্রকাশিত হয়েছিল। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত 'ভারত শ্রমজীবী' মাসিক পত্রে ১৮৭৪ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী একটি কবিতাতে লিখেছেন ঃ

"ওই দেখ সাগরের পারে,
শ্রমজীবী শত শত
কেমন সংগ্রামে রত
এই ব্রত—রবে না আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবারে"।

কোন কোন গবেষকের অনুমান এটা প্যারী কমিউনের উদ্দেশ্যে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতে সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গ আরও সুস্পষ্ট।

১৮৭৯ সালে প্রকাশিত 'সাম্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "...'ভূমি সাধারণের' এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়া ছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাবধি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। 'কমিউনিজম' সেই বৃক্ষের ফল। ইণ্টার-ন্যাশনাল সেই বৃক্ষের ফল।" 'কমিউনিজম' 'ইণ্টারন্যাশনাল' প্রভৃতি শব্দ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে ইউরোপের প্রাসঙ্গিক সংবাদ বা তথ্য তাঁর জানা ছিল। ১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকাতে 'ক্যাথলিক সোস্যালিজম' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, "য়ুরোপে কিছুদিন হইতে 'সোস্যালিষ্ট' নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। পরের বছর 'সাধনা'তে তিনি আরও স্পষ্ট করে লিখলেন, "...সোস্যালিজম' সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানব সমাজের ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।"

১৮৯৩ সালে অরবিন্দ ঘোষ এক প্রবন্ধে লেখেন "নিম্নশ্রেণীর ক্ষমতা ও সভতার ভিত্তিতে সমগ্র মানব জাতির গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার ঝোঁকের উপরেই নির্ভর করছে গোটা জাতির ভবিষ্যত।" ঐ বছরই আবার একটি প্রবন্ধে তিনি আরও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "...ঐ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও প্রলেটারিয়েটের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের আশার আমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা।" 'প্রলেটারিয়েট' শব্দটি তিনিই সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম সচেতন ভাবে ব্যবহার করেন।

এই ভাবে ভারতীয় মধ্যবিত্ত, যাঁরা জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে বুর্জোয়াদের মুখপাত্রের ভূমি-কায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের অংশবিশেষের চিন্তায়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র না হলেও, কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গ দীর্ঘকাল পূর্বেই বেশ কিছুটা স্থান করে নিতে সুরু করে। ক্রমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রসঙ্গও এসেছে। ১৯০০ সালে 'ডন' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনাতে ভারতীয় শ্রম-জীবীদের দুর্দ্দশা প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে, এঙ্গেলসের 'কনডিশন অব দি ওয়াকিং ক্লাশ ইন ইংল্যাণ্ড ইন ১৮৪৪" গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৩ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায় কার্ল মার্কসের নামের উল্লেখ করা হয়েছিল গদর। পার্টির সম্পা-দক, বিখ্যাত বিপ্লবী লালা হরদয়াল ১৯১২ সালে মডার্ন "রিভিউ" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে মার্কসের জীবনী লেখেন। ঐ বছরই মালয়ালম ভাষায় কেরালার রামকৃষ্ণ পিল্লাই মার্কসের জীবনী অনুবাদ করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রচার আন্দো-লনে ১৯০৫ এর রুশ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উল্লেখ পাওয়া যায়। "সোনার বাংলা" শীর্ষক ইস্তা-হারে লেখা হয়েছিল, "বাঙ্গালি। নিরস্ত্র বলিয়া হতাশ হইওনা। রুশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখ তাহারা কিরূপে বিপ্লব চালাইতেছে। তোমাদেরও তদ্রুপ করিতে হইবে।" এই সময় অমৃতবাজার পত্রিকা, দৈনিক হিতবাদী, হিতবার্তা, যুগান্তর, নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকাতে ঐ রুশ বিপ্লব সম্পর্কে সহানুভূতিমূলক বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়।

(ছয়)

উল্লিখিত উদাহরণগুলি ভারতের সমগ্র মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসিকতা ও ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি নয় ঠিকই। কিন্তু ভারতের মধ্যবিত্ত-দের উপর নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বিপ্লব-পূর্ব এইসব ধারাবাহিকতার গভীর মূল্য রয়েছে। কেননা এই সব ঘটনা নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে মুক্তির অন্বেষী উত্তরসূরীদের অনেকের কাছে সূত্র জুগিয়ে দিয়েছিল। ভারতের ভেতরে অভ্যুত্থান বা বিপ্লবী সংগ্রাম করার জন্য বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি, গ্রুপ বা দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বিদেশ যাত্রা, 'প্রবাসী ভারত সরকার' গঠন, বিদেশে নানান সংস্থা গঠন, কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন, নভেম্বর বিপ্লবে বেশ কিছু ভারতীয় রাইফেল হাতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ এবং শ্বেত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়া, অন্যদিকে ভারতের অভ্যন্তরেও রুশ বিপ্লব প্রবাহ সঞ্চারের জন্য প্রস্তুতি ও প্রয়াসের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে শ্রম-জীবী এবং মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই ছিলেন প্রধান। পরবর্তীকালে মার্কসবাদে দীক্ষা গ্রহণ ও শ্রেণী অবনমনের মধ্য দিয়ে এঁদের অনেকেই শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিতে রূপান্তরিতও হয়ে-ছিলেন।

নভেম্বর বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী কালে ভারতীয় মধ্যবিত্তের অংশ বিশেষের মানসে বিপ্লবের প্রভাব ও সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। ছ'বছর মান্দালয়ে কারাজীবন যাপন থেকে ফিরে এসে বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় জানুয়ারী, ১৯১৮তে 'রুশ নেতা লেনিন' নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি বিপ্লব শেষে রুশ সরকারের শান্তির ডিগ্রী, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ইত্যাদি সমর্থন করেছিলেন। ঐতিহাসিক কে-এম-পানিক্কর তাঁর 'সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি' পুস্তকে বলেছেন, "এই শতকে ভারতের রাজ-নৈতিক ও নৈতিক বিকাশে যে মহত্তম ঘটনা এককভাবে প্রভাবিত করেছে, তা হল রুশ বিপ্লব। শুধুমাত্র রুশ দেশে নয়, পামীর সীমান্তে সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা দখল ভারতের তরুণ সম্প্রদায়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সেকালীন সংবাদপত্রে এবং পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় অনেকেই এই নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। এমনকি বিপ্লবের মাত্র ছ'মাস পরে ভারত সচিব মণ্টেগু এবং বড়লাট চেমস্‌ফোর্ড যে রিপোর্টটি দাখিল করলেন (২২শে এপ্রিল, ১৯১৮) তাতে উল্লিখিত হয়েছে, "রুশ বিপ্লবকে ভারতে গ্রহণ করা হয়েছে স্বৈরাচারের অবসান হিসাবে। ভারতের রাজনৈতিক উচ্চাশা ও লক্ষ্যকে এই বিপ্লব নতুন শক্তি দিয়েছে।..." নভেম্বর বিপ্লবের বিশাল সাফল্যের তরঙ্গাঘাতে ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রধান মুখপত্র 'স্টেটসম্যান', প্রচণ্ড বিচলিত ভাবে হলেও, যে সত্যকে লিখতে বাধ্য হয়েছিল তার বয়ান ছিল ঃ "প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইতিহাসে যত রকম বিপ্লবী প্রচেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সর্বাত্মক ও বিপজ্জনক হচ্ছে রাশিয়ার বিপ্লবী সরকারের কার্যকলাপ।" (স্টেটসম্যান, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯১৭)। মুজাফ্‌ফর আহমেদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথায় লিখেছেন যে রুশ বিপ্লবের ঠিক পরেই সোভিয়েৎ দেশ সম্পর্কে "যুক্ত প্রদেশের (এখনকার উত্তর প্রদেশের) অনেক লেখক রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে পত্র পত্রিকায় লিখেছেন। " ঐ পুস্তকেই তিনি রুশ বিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কে নজরুল ইসলামের "ব্যথার দান" গল্পটির উদাহরণ দিয়েছেন। ১৯২০ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশিত ঐ পুস্তকের কাহিনীর নায়ক লালফৌজে যোগ দিয়ে প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়েছিল। এই সময়কালে অসংখ্য পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত বিপ্লব সম্পর্কিত তথ্য, সমাজতন্ত্র বিষয় প্রবন্ধ, প্রচার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বর্দ্ধিত আকর্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। বিপ্লবের প্রসঙ্গে সর্বাধিক সংবাদ, মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল স্বরাজ্য পার্টির সাথে যুক্ত পত্রিকা—আত্মশক্তি (সাপ্তাহিক)তে। রুশ বিপ্লব প্রভাব মধ্যবিত্ত মানসে কেমন ঘটছিল তার একটা উদাহরণ রয়েছে মুজাফ্‌ফর আহমেদের "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ" পুস্তিকাতে। ১৯২০ সালে মুজাফ্‌ফর আহমেদ ও নজরুল ইসলামের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নবযুগ'। ঐ পত্রিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে ঃ "কাগজখানা

বা'র করার মুখে আমার একজন বন্ধুও (তিনি রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না) আমায় বলে-'ছলেন যে "বাঙলা কাগজগুলো বড় বেশী ভাবপ্রবণ হয়। আপনারা সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে, বিশেষ করে মজুর ও কৃষকের সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখবেন।" এটা তাঁর ওপরে রুশ বিপ্লবের প্রভাব ছাড়া আর কি হতে পারে?" তাছাড়া 'নব্য ভারত,' ও 'সাম্যবাদী' পত্রিকাতে পরবর্তী কালে সমাজতন্ত্রের সাফল্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা হয়েছে। বিশের দশক থেকে তিরিশের দশকের প্রথমার্ধের মধ্যে রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ভারতের মধ্যবিত্তদের মধ্যে কিছুটা বর্দ্ধিত ভাবেই অনুভূত হতে থাকে। পরবর্তী কালে চরম কমিউনিজম ও রুশ বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই ছিলেন তাঁদের মধ্যে। জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের প্রধানতম প্রতিনিধি-দ্বয় গান্ধীজী ও জওহরলাল নেহরুও নভেম্বর বিপ্লবের পক্ষে সমর্থন সূচক বক্তব্য রেখেছেন বা বিপ্লবের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০-এ 'রাশিয়ার চিঠি'তে বিপ্লব সাফল্যকে অভিনন্দিতই করেছিলেন। অক্টোবর, ১৯২০-তে ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এ. আই. টি. ইউ. সি-র প্রতিষ্ঠা ও তার প্রথম সম্মেলনে ব্যাপকভাবে রুশ বিপ্লব প্রসঙ্গ আলোচিত হওয়া এক অর্থে স্বাভাবিক ঘটনা—কেননা এটা ছিল শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠন। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি না হয়েও সম্মেলনের সভাপতি লালা লাজপত রায় বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে অভিনন্দিত করেছিলেন।

ভারতীয় পরিসরে মধ্যবিত্তরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস দলকেই বেছে নিয়েছিল। কমিউনিস্টদের অংশ বাদ দিলে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁদেরও অনেকেই নভেম্বর বিপ্লবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যেমন ১৯৩৪-এ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনের সভাপতি আচার্য নরেন্দ্র দেব নভেম্বর বিপ্লবের ভাবধারাকে ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনে ছড়িয়ে দেবার কথা বলেছিলেন। ১৯৩৯-এ সারা ভারত কিষাণ সভার সম্মেলনে তিনি বলেন, "রুশ বিপ্লব ভারতের উৎপীড়িত কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য নবযুগ সৃষ্টি করেছে।" ঐ পার্টির প্রথম সম্পাদক জয়প্রকাশ নারায়ণ নভেম্বর বিপ্লবের সমর্থনে "হোয়াই সোস্যালিজম" লিখেছিলেন। এগুলো তাঁরা করেছিলেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যাখ্যা মত। কখনো বা কংগ্রেসী নীতিকে প্রভাবিত করার জন্যও। যদিও তার কোন সার্থক সাফল্য আসেনি। কেননা কংগ্রেস দল ছিল জাতীয় মালিক-জমিদার শ্রেণীর শ্রেণী-সংগঠন। সুতরাং মধ্যবিত্তদের ইচ্ছা বা শ্রেণীগত দৃষ্টির সাধারণ প্রতিফলন কংগ্রেসের মাধ্যমে প্রকাশের কোনো সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল না।

(সাত)

সমাজ বিজ্ঞানের নিয়মের বেশ কিছুটা বিকৃতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় মধ্যবিত্তের অ-প্রথাগত ভাবে আবির্ভাব হয়েছিল। তার প্রতিফলন পড়েছে পরবর্তী কালে এই শ্রেণীটির ভাবনা ও কার্য্যকলাপের বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে। রুশ দেশে নভেম্বর বিপ্লব যখন সম্পন্ন হল সমকালেই ভারতীয় পটভূমিতে জাতীয় কংগ্রেসের বর্দ্ধিত রাজনৈতিক প্রয়াস শুরু হয়। প্রায় এ সময়েই গান্ধীজী এসে কংগ্রেসের হাল ধরেছেন পুরোপুরি। পাশাপাশি ঐ সময় কাল থেকেই ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সৃষ্টি ও শ্রমিক আন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতি ঘটতে থাকে। আবার এই সময় থেকেই প্রাথমিক ভাবে ও তিরিশের দশকের প্রথম পর্যায় থেকেই পুরোপুরি মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও আন্দোলনে ব্যাপক হতাশা ও ভাঙ্গন শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দাজনিত সংকটের প্রতিফলন পড়ে ভারতের অর্থনীতিতেও। এই ঘটনাগুলি মধ্যবিত্ত সমাজকে প্রচণ্ড টানা পোড়েনের সম্মুখীন করে। ফলে ভাসমান এই শ্রেণীটি রুশ বিপ্লব সহ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই শ্রেণী হিসাবে তখনই আত্মস্থ করতে পারেনি। তবে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে মধ্যবিত্ত অফিস কর্মচারীদের বৃত্তিগত সংগঠন এই শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে গড়ার প্রবণতা শুরু হয়েছিল। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য প্রশাসনে মধ্যবিত্ত সরকারী কর্ম-চারীদের, শিক্ষকদের, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের। মার্কেনটাইল কর্মচারীদের সংগঠন আরও ব্যাপক ভাবে গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সংগঠন ও আন্দোলনের প্রসারের ক্ষেত্রে নভেম্বর বিপ্লবের যে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল, তার কোন চিহ্ন এই সব সংগঠনে দেখা যায়নি। রুশ বিপ্লবের সময়ের দিক থেকে এই সব মধ্যবিত্ত সংগঠনগুলির উদ্ভবের কালের মিল থাকার জন্য কেউ কেউ এগুলি বিপ্লবের প্রভাবে সৃষ্ট বলে দাবী করে থাকেন। কিন্তু এই দাবীর সামান্যতম কোন সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত এই সব সংগঠনগুলির নেতৃত্বে কোন ধরণের সংগঠিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ১৯৪৩ সালের আগে ভারতে অনুষ্ঠিত হয়নি। কেবলমাত্র এই পর্য্যায়ে এসেই এই সব সংগঠনগুলিতে কিছুটা নতুন চেতনার আলোক সম্পাত ঘটেছে। এটা প্রধানত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েট বাহিনীর অতুলনীয় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও বিজয়ের প্রভাব বশত। তাছাড়া যুদ্ধ শেষেই পূর্বইউরোপে আরও অনেকগুলি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রের এই বর্দ্ধিত সাফল্য মধ্যবিত্তের মধ্যে আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। অন্যদিকে ভারতের বুকেও কমিউনিস্ট শক্তির প্রভাব তখন বর্দ্ধিষ্ণু। ফ্যাসীবাদ বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনগুলির তৎপরতা কমিউনিস্ট ও সোভিয়েত ভীতির পরিবেশকে অনেকটাই অপসারিত করেছিল। তাছাড়া ব্যাপক আর্থিক সংকট ছিল মধ্যবিত্তের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টির মূলভিত্তি। ১৯৪৬ সালে ডাক-তার কর্মী ধর্মঘট, আই. এন. এ'র বিচারকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী প্রতিবাদ, নৌবিদ্রোহ, ব্যাপক শ্রমিক ও ছাত্র আন্দোলন, প্রভৃতি এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের নিশ্চিত বাস্তবতা মধ্য-বিত্তকে দোদুল্যমানতা থেকে অনেকটাই উর্দ্ধে উঠতে সাহায্য করে।

মধ্যবিত্ত সমাজকে সংগঠিত হতে সাহায্য করতে এই সময়েই সুনির্দিষ্ট ভাবে এগিয়ে আসে শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শে বিশ্বাসী বেশ কিছু মানুষ ও সংগঠন। ১৯৪৬-৪৭ সালে কলকাতাতে শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকে যে 'নভেম্বর বিপ্লব দিবস' পালিত হত, তাতে প্রশাসনের সহ বেশ কতকগুলি মধ্যবিত্ত সংগঠন অংশ গ্রহণ করতে থাকে। শ্রমিকশ্রেণীর ডাকে অনুষ্ঠিত সাধারণ ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ বা অন্যের আন্দোলনের সমর্থনে সৌভ্রাতৃত্বমূলক নানান কর্মসূচীতেও মধ্যবিত্তদের প্রত্যক্ষভাবে সাড়া দেবার সূত্রপাত ঘটে এই সময়েই।

(আট)

প্রাক্-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নভেম্বর-বিপ্লব-প্রভাব-মণ্ডলের আলোচনাতে আবার ফেরা যাক্। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষার্ধেই মুসলমান ধর্মীয় জগতে নানান ঘটনার সংঘাত চলছিল—যা ক্রমশঃ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছিলো। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে না গিয়েও কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য। রুশবিপ্লব সম্পন্ন হবার পরই সোভিয়েত সরকার, পূর্বের জার সরকারের সাথে ইংরেজ সরকারের তুরস্ক ও পারস্যের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত চুক্তিগুলি বাতিল করে দেয়। সোভিয়েত সরকার "রাশিয়া ও প্রাচ্যের সকল মেহনতী মুসলমান"-এর কাছে ৩রা ডিসেম্বর, ১৯১৭,

তারিখে প্রেরীত এক বাণীতে এই কথা ঘোষণা করে। বাণীটির শেষ কথাটি ছিল "আমাদের পতাকায় আমরা পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তির বাণী উৎকীর্ণ করেছি।" এরপর ব্রিটেনের আশ্রয় থেকে আফগান সরকারকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে সোভিয়েট সরকার। ২৮ শে ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯২১ তারিখে ব্রিটিশ বিরোধিতা সত্ত্বেও সোভিয়েট আফগান মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

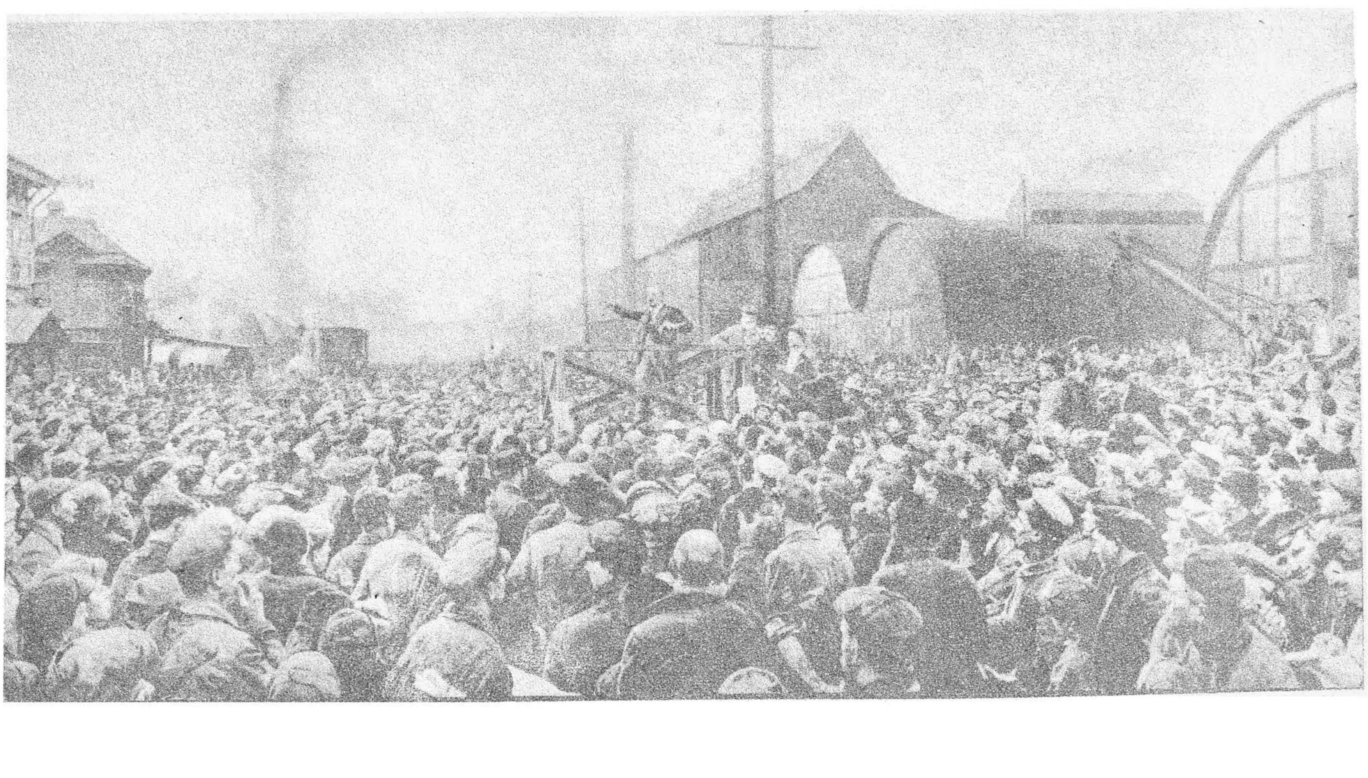
ভারতে খিলাফৎ আন্দোলনের দ্বারা সৃষ্ট ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের পাশাপাশি সোভিয়েট সরকারের পূর্বোক্ত কার্য্যকলাপ রুশদেশের প্রতি মুসলমান সমাজের আকর্ষণকে বাড়িয়ে দেয়। এই ভাবে রুশবিপ্লবের পরোক্ষ প্রভাব ভারতের মুসলমান, বিশেষতঃ তাঁদের নেতৃত্বদানকারী অগ্রসর অংশের মধ্যে গভীর ভাবে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় "জমানা" নামে উর্দু পত্রিকাতে ৭ই এপ্রিল, ১৯২১ তারিখে লেখা হ'ল "ব্রিটিশ সরকার বলশেভিকদের মুসলমানদের শত্রু বলে চিহ্নিত করে এতদিন মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছিল। কিন্তু "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশগুলোর সংগে সোভিয়েট সরকারের মৈত্রীচুক্তির বয়ান ঐ প্রচারের মুখোশ খুলে দিল। ফলে দেখা গেল মুসলমান দেশগুলির মুক্তির পথে সাহায্য করছে বলশেভিকরা।" মুসলমানদের মধ্যে বিপ্লবের এই প্রভাবের ফলেই ভারতের তদানীন্তন গভরণর জেনারেল চেমস্‌ফোর্ড গান্ধীজীকে আফগান বিরোধী প্রচারে নাবাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। রাশিয়ার বিপ্লবের পথের সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজীকে সেই সময়ে অন্ততঃ বলশেভিকদের সমর্থন করতে হয়েছিলো।

নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব মধ্যবিত্তদের মধ্যে পড়ার প্রতিফলন ধরাপড়ে অপর একটি ধারাতেও। তা' হল সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকারদের কর্মকাণ্ডের পরিসরে। অকমিউনিষ্ট এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পত্র-পত্রিকা, সেগুলির সাংবাদিকরা এবং কবি-সাহিত্যিকদের বিভিন্ন সাহিত্যকৃতির মধ্যদিয়ে প্রাক্ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাল পর্যন্ত রুশবিপ্লবের সমর্থনে নানান ধরণের লেখা প্রকাশিত হয়। সাংবাদপত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলার অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, ফরওয়ার্ড, হিন্দীভাষাতে—বিশ্বামিত্র ও বাংলাভাষাতে—দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, বাংলার কথা, দৈনিক বঙ্গবাণী ইত্যাদি। সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে—ইন্ডিয়ান রিভিউ, সোস্যালিস্ট, হিন্দি অভ্যুদয়, প্রভা, বাংলা আত্মশক্তি, তত্ত্ববোধিনী, লাঙ্গল ও পরে গণবানী, দেশ, ধূমকেতু, নবশক্তি, পরিচয়, প্রবাসী, মাসিক বসুমতী, প্রভৃতি।

(নয়)

নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব প্রসঙ্গে ভারতের মধ্যবিত্তের মানসিকতা বা ভূমিকার সামগ্রিক পর্য্যালোচনার প্রয়াস তেমনভাবে হয়েছে বলে জানা নেই। স্বাভাবতঃই বর্তমান আলোচনাটি খুবই খণ্ডিত এবং আংশিক ও বটে। তবে ভারতের সমগ্র রাজনৈতিক সামাজিক পরিসরে ও রাজনৈতিক দলগুলিতে ও তাদের কার্যকলাপে মধ্যবিত্তদের যে ধরনের ব্যাপক প্রভাব ও সংখ্যাধিক্য আজও দেখা যায়, তাতে মধ্যবিত্তের ওপর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সময়ের জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাবের একটা মোটামুটি ধারণা করা চলে। এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর একান্ত সংগঠন—কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে শ্রেণীগত উদ্ভবের পরিসংখ্যানেও প্রথম যুগ থেকেই মধ্যবিত্তের আধিক্য আজও বহুলাংশে বিদ্যমান। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর তাঁরা নিঃসন্দেহে শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আর মধ্যবিত্ত নন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনে আসবার প্রস্তুতিপর্বে এই সব ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে রুশ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের প্রতি দুনিবার আকর্ষণকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

আর একটি বিষয়ওউল্লেখযোগ্য। স্বাধীনত্তোর কালে ভারতের কলমালিক—জমিদার শাসক-গোষ্ঠীগুলির পক্ষ থেকে 'সমাজতন্ত্রে'র নামে নানান স্লোগান আজও অব্যাহত। এই বক্তব্যের মধ্যে তাদের নানান কৌশলগত দিক রয়েছে ঠিকই। আবার উনবিংশ শতাব্দী থেকে নানান ধরনের সমাজতন্ত্রের প্রতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আকর্ষণ ও সমর্থনের দীর্ঘ ঐতিহ্যজনিত চাপের প্রতিফলনও এতে আছে বলে মনে হয়। শ্রমজীবী জনগণের মানসিকতার পাশাপাশি খুব সংবেদনশীল ও দ্রুত মুখর মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখের দিকে চেয়েও শাসকশ্রেণীকে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দেবার এই কৌশল নিতে হয়েছে—একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।



১৯১৭ সালের মে মাস, শ্রমিক-সমাবেশে লেনিন ঃ শিল্পী ব্রোদ্স্কি

সর্বশক্তি প্রয়োগে খরা

বর্তমান খরা পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি মহাক
ভূমি-ভূমিরাজস্ব ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী
মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সাংবাদিকদের নিকট উপরোক্ত ঘোষণা করে শ্রী
আকার ধারণ করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে
হয়েছে। এবার খরায় প্রথম দিকে ২০ ভাগ রো
ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। আউশও লক্ষ্য মাত্রা
এরও অর্ধেক নষ্ট হয়ে গেছে। পরিস্থিতি যেভাবে ম
নেই। জলাধারগুলিতে জল নেই। কাজেই সেচের
ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা জোরদার করার উপর নজর দিচ্ছে।

খরা মোকাবিলায় সি. এ. ডি. সি.'র কর্মসূচি

বর্তমান ভয়াবহ খরাজনিত পরিস্থিতিতে সি. এ. ডি. সি. র অধীন এলাকায় বোরো ধানের চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ বোরো ধানের চাষ করতে দরকার হয় প্রচুর পরিমাণে জল। তাই সি এ. ডি. সি. কৃষকদের বোরো ধানের পরিবর্তে ডাল, গম, সরষে প্রভৃতি চাষের দিকে উৎসাহিত করতে চায়। পূজাবকাশের পূর্বে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সি. এ. ডি. সি. র ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীবিপ্লব দাশগুপ্ত এই কথা জানান। ডাল, গম, সরষে প্রভৃতি চাষ করতে জলের দরকার হয় সামান্যই।

তিনি আরও বলেন, খরা মোকাবিলা করার জন্য সি. এ. ডি. সি কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, এইসব কর্মসূচির মধ্যে আছে সামান্য জলকেও যাতে বেশি বেশি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তার জন্য কম জল লাগে এমন ফসলে সি. এ. ডি. সি. কৃষকদের উৎসাহিত করতে এবং এরই ধাপ হিসাবে সি. এ. ডি. সি. তার এলাকায় বোরোচাষ নিষিদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ সি. এ. ডি. সি. এলাকায় সি. এ. ডি. সি. কৃষকদের বীজ, সার, কারিগরি সহায়তা দান করবে, এছাড়া জলের উৎস সৃষ্টির জন্য সি. এ. ডি. সি উত্তরবঙ্গে ১৬০০ বাঁশের নলকূপ বসাবার এক পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামী ৩।৪ মাসের মধ্যেই এই কাজ শেষ হবে।

খরার দুর্বিষহ দিনগুলিতে শ্রমদিবস সৃষ্টির ক্ষেত্রে সি. এ. ডি. সি অধিক গুরুত্ব আরোপ করবে। এ জন্য ইউনিসেফের সাহায্যে ৯টি জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ৭০টি কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সব শিল্পের মধ্যে থাকবে চরকা ইউনিট, বেকারী, ফুড প্রসেসিং প্রভৃতি। ইউনিট পিছু ব্যয় ধরা হয়েছে এক লক্ষ টাকা। এর ৪০ ভাগ ইউনিসেফ ও ৬০ ভাগ দেবে সি. এ. ডি. সি।

ইউনিসেফের সাহায্যে সি. এ. ডি. সি. আরও কতকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সি. এ. ডি. সি এলাকায় ৫৬০ টি প্রস্রাবাগার ও ৫৬৭ টি নলকূপ করার জন্য ইউনিসেফ অর্থ সাহায্য করেছে। শ্রীদাশগুপ্ত জানান, ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ হয়ে যাবে।



জলাভাবে হুগলী জেলার বহু এলাকায় চাষ হয়নি। চাষের জমিতে আমন চাষের মরশুমে

১৫টি জেলার জেলাপরিষদের সভাধিপতি ও জেলা শাসকদের নিয়ে এই উচ্চ পর্যায়ের সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, ভূমি রাজস্ব ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী ও প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুনীল মজুমদার, কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ, সেচমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচমন্ত্রী শ্রীকানাই ভৌমিক, ত্রাণমন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জি, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীরাধিকা ব্যানার্জি ও প্রতি-মন্ত্রী শ্রীঅচিন্ত্য রায়, অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীশান্তি ঘটক, আদিবাসী ও তফসিলী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীশম্ভু মাণ্ডি, বিভাগীয় দপ্তরের সচিবরা, মুখ্যসচিব, আই জি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচৌধুরী বলেন, চাষের কাজ মার খাওয়ায় খেতমজুরদের কাজ নেই। নিড়ানীর কাজ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনি যা ফসল হবে তাতে কাটার সময় কম লোক লাগবে। কাজেই বেশি লোক কাজ পাবে না। এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি দপ্তরকে বলা হয়েছে শ্রমদিবস সৃষ্টি করার জন্য—যাতে গ্রামের লোকের কর্ম-সংস্থান হতে পারে। খরার মোকাবিলা করার জন্য এন. আর. ই. পি, ত্রাণ, কৃষি প্রভৃতি দপ্তরগুলি যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করবে তার সবই হবে সেচভিত্তিক। অর্থাৎ খাল কাটা পুকুর সংস্কার, কূপ খনন, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে জলের উৎস নির্মাণের জন্য কাজ করা হবে যাতে কিছুটা সেচের ব্যবস্থা করা যায়। চালু সেচ ব্যবস্থায় যাতে বিদ্যুতের সরবরাহ অব্যাহত থাকে তার জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে বলা হয়েছে।

শ্রীচৌধুরী জানান, জাতীয় গ্রামীণ কর্ম-সংস্থান প্রকল্পের অধীনে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ২ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টির এক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্র থেকে ৭ কোটি টাকা ও ৯ হাজার টন গম পাওয়া গেছে। দৈনিক ৬ টাকা অথবা ১ কেজি চাল ও নগদে মোট ৬ টাকা মজুরি দেওয়া হবে। ত্রাণ এবং অন্যান্য দপ্তর থেকেও যেসব কাজ করানো হবে সেক্ষেত্রেও ন্যূনপক্ষে ৬ টাকা হারে দৈনিক মজুরি দিতে হবে। ত্রাণের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, গ্রামের দিকে যেসব সরকারি কাজ কনট্রাকটারদের হাতে আছে তাদের বলা

মোকাবিলায় রাজ্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

রণে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শেষে বলেছেন, সর্বশক্তি নিয়োগ করে খরা পরিস্থিতি

বিনয় চৌধুরী বলেন, খরা পরিস্থিতি খুবই মারাত্মক গতবছরই আমন ফসল শতকরা ৩৫ ভাগ কম যায়নি। পরে যা রোয়া হয় তারও অর্ধেক কে ৫ লক্ষ একর জমিতে কম বোনা হয় এবং ত্মক হচ্ছে তাতে আরও ফসল নষ্ট হবে সন্দেহ লও দেওয়া যাবেনা। এই পরিস্থিতিতে সরকার

য়েছে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজের লোক নেবার ন্য। প্রতিটি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ কছে। সরকারের লক্ষ্য অন্ততঃ প্রতিটি রিবারের একজন করে যাতে কাজ পায় তার বস্থা করা। এতে বেশি লোক উপকৃত বেন।

শ্রীচৌধুরী জানান, কাজের অগ্রগতি খতিয়ে খার জন্য মহাকরণে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তদারকি দল থাকছে। জেলাগুলিতেও জেলাস্তরে তদারকি দল গঠন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্ভব হলে ব্লক স্তরেও এই দল তৈরি করতে হবে।

খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনমত খাদ্য না আসায় রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাজারে চালের দাম বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবি করছি প্রতি মাসে ৪ লক্ষ টন খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। নচেৎ পরিস্থিতি হবে মারাত্মক।

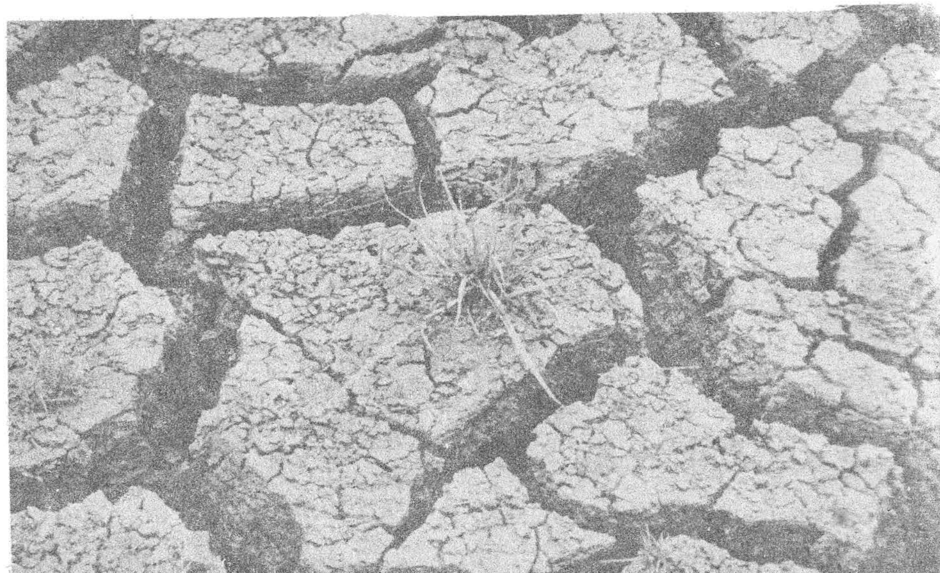
রেশন ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আগে অনেকে পুরো রেশন তুলতেন না কিন্তু এখন তোলেন। কিন্তু রেশন গ্রহীতাদেরই তাদের প্রাপ্য খাদ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরবরাহ ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টনের মধ্যে ২ লক্ষ ১০ হাজার টন রেশনের জন্য। তিনি বলেন, খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে রেলের ওয়াগনের সমস্যা যাতে না হয় সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। এছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে এফ. সি. আই কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলা হবে যাতে বিভিন্ন জেলায় সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন না ঘটে। প্রায় সব জেলা থেকেই এ সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শ্রীবিনয় চৌধুরী বলেন ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিকেশ হচ্ছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি সমীক্ষক দল পাঠাবার জন্য অনুরোধ করছি যাতে তারা নিজেরা এসে পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন। রাজ্য সরকার প্রেরিত রিপোর্ট পাবার পর কেন্দ্রীয় সরকার সমীক্ষক দল পাঠাবার ব্যবস্থা করবে বলে আমাদের আশা আছে।

খরা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের ব্যাপক কর্মসূচি

খরা মোকাবিলায় রাজ্যসরকার ত্রাণকার্য এবং কর্মসংস্থান করার জন্য আগামী বছরের জুন মাস পর্যন্ত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য ইতি-মধ্যেই ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পূজাবকাশের পূর্বে মহাকরণে মুখ্যসচিব এস. ভি. কৃষ্ণাণ উপরোক্ত মর্মে সংবাদ জানিয়ে বলেছেন —আগামী জুন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী ফসলের আগে পর্যন্ত মোটামুটি একটি হিসাব করে দেখা গেছে, ফসল, খেতমজুরদের মজুরি এবং আনুষঙ্গিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৯৫০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলের আসা এবং কেন্দ্রীয় সাহায্যের দিকে তাকিয়ে না থেকে সরকার অবিলম্বে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া বাজেটে আরও ৪ কোটি টাকার সংস্থান আছে। সব মিলিয়ে ৩৯ কোটি টাকা হাতে নিয়ে কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে। এই টাকা খরচের হিসাব নিম্নরূপ—ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার জন্য ৭ কোটি, নতুন পাম্পসেট কেনার জন্য ৭ কোটি, পাম্পসেট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩ কোটি, বীজ কেনার জন্য ৬ কোটি, কূপ খননের জন্য ৪ কোটি, টিউবওয়েল বসানোর জন্য রিগ ক্রয় বাবদ ২ কোটি এবং পুকুর সংস্কারের জন্য ১০ কোটি টাকা।

কৃষিমজুরদের মজুরিসহ টাকার অঙ্কে ফসল নষ্ট হয়েছে আমন ৫০০ কোটি, রবি শস্য ৩৪০ কোটি, পাট ৫৭ কোটি, আউশ ৫৩ কোটি টাকার। মুখ্যসচিব বলেন, এই টাকার প্রায় অর্ধেক আগামী জুন পর্যন্ত কৃষিমজুরদের মজুরি এবং আনুষঙ্গিক খরচ।



হুগলি জেলার বৃষ্টি শূন্য চাষের জমি। রুক্ষ মাটি ফেটে চৌচি

নভেম্বর বিপ্লব : শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে প্রভাব

ভবতোষ রায়

১৯১৭ সালে রাশিয়ার যে বিপ্লব সংগঠিত হয় তাই নভেম্বর বিপ্লব নামে পরিচিত। নভেম্বর মাসে এই বিপ্লব পরিচালিত ও সাফল্য-মন্ডিত হয়। তাই এই বিপ্লবকে 'নভেম্বর বিপ্লব' বলা হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার মানুষ যখন এই' বিপ্লবী অভ্যুৎত্থানে সামিল হয়েছিলেন তখন রাশিয়ার পুরান ক্যালেন্ডারের হিসাবে মাসটা ছিল অক্টোবর মাস। তখন তাই রাশিয়ার এই বিপ্লবকে অক্টোবর বিপ্লব বলা হত। পরবর্তী পর্যায়ে ক্যালেন্ডারের পরিবর্তনের ফলে সেই সময়কার হিসাবমত যা ছিল অক্টোবর মাস নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী তা হল নভেম্বর মাস। তাই অক্টোবর বিপ্লব 'নভেম্বর বিপ্লব' নামে অভিহিত হল।

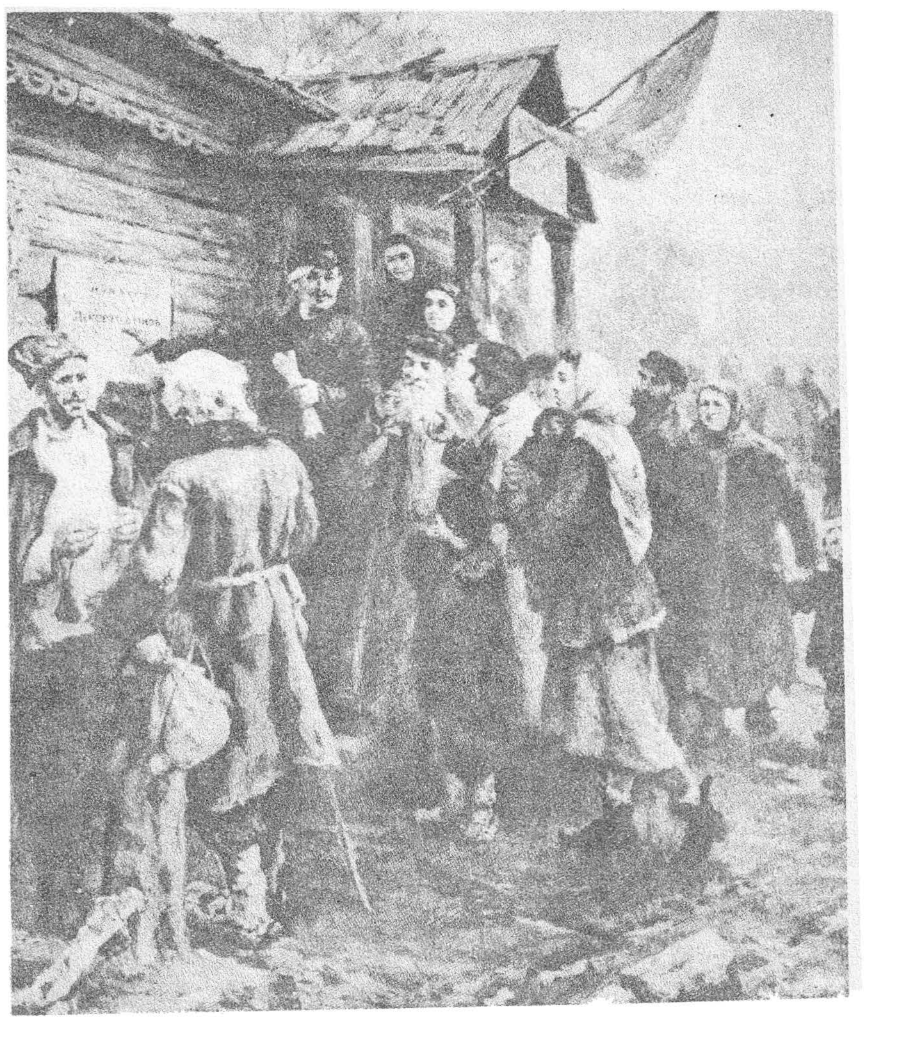
ভি. আই. লেনিন ছিলেন এই বিপ্লবের রূপকার। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির যে অংশ এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিল তা বল-শেভিক পার্টি নামে পরিচিত ছিল। এই বল-পার্টির নেতা ছিলেন লেনিন। বিপ্লবের রূপকার কথাটির মধ্য দিয়ে আরো অনেক কিছু বলতে চেয়েছি! রাশিয়ার এই বিপ্লবে লেনিনের অবদান ঠিক এক কথায় বা কয়েকটা শব্দের ব্যঞ্জনার গন্ডীর মধ্যে থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না। অবশ্য বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় ও তাই নয়। কাজেই আমরা সে আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। তবে শুধু এই টুকু বলা প্রয়োজন যে বিপ্লব সম্বন্ধীয় মার্কসীয় তত্বকে রাশিয়ার পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার উপযুক্ত করে উদ্ভা-বন করা, পার্টির সংগঠন গড়ে তোলা, বিপ্লবের পরিকল্পনা রচনা করা, বিপ্লবকে পরিচালনা করা ইত্যাদি সব কিছুর ক্ষেত্রেই লেনিন ছিলেন পুরোধা এবং নেতা।

১৯১৭ সালের রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট মন্ডিত ছিল। ইতি-পূর্বে সংগঠিত সমস্ত বিপ্লব থেকে এই বিপ্লব চারিত্রিক দিক থেকে ছিল অভিনব। এর অন্তর্বস্তু ও মর্মবাণী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ১৯১৭ সালের আগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যে সব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে নিশ্চিতই সমাজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও সম্পর্কের মধ্যের ভারসাম্য ব্যহত ও পরিবর্তিত হয়ে নতুন ভারসাম্য স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এ ধরনের আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও সমাজের শ্রেণী বিভক্ত ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিপ্লবের আগেও সমাজ শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, বিপ্লবের পরও তাই থেকেছে। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যা ঘটেছে তা হল শোষক ও শাসকশ্রেণীর পরিবর্তন।

পৃথিবীতে নভেম্বর বিপ্লবই প্রথম বিপ্লব যা শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে সমাজ থেকে শোষনের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কার্যকর পথ গ্রহণ করল। প্রকৃত পক্ষে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম বাস্তব, বৈপ্লবিক সফল পদক্ষেপ হল নভেম্বর বিপ্লব। আমরা এখানে 'প্যারী কমিউন'এর কথা বলছি না কারণ তা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি।

স্বাভাবিকভাবেই এই বিপ্লব পৃথিবীর সর্বত্র শোষিত নিপীড়িত মানুষকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করল এবং তাঁদের মনে আশার আলো নিয়ে এল। একটা যুগান্তকারী চিন্তার বাস্তব রূপায়ণ দেশে দেখে যুগে যুগে যাঁরা বঞ্চিত, নিগৃহীত হয়েছেন, তাঁদের এতদিনের সংস্কারের ভিতে ফাটল ধরিয়ে

শান্তি সম্পর্কিত আদেশনামা ঃ শিল্পী ইভানভ্



দিল। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় মানব সমাজ তথা সভ্যতার এক নতুন জয়যাত্রা তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল।

১৯৩০ সালে অসুস্থ দেহ নিয়ে সত্তর বছরের বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন চিঠির মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন যা 'রাশিয়ার চিঠি' নামে বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। এই চিঠি পর্বের প্রথম চিঠিতে তিনি বলছেন।

"রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোন দেশের মতই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।"

প্রকৃত পক্ষেই রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টি বাইরের আবরণকে ভেদ করে বিপ্লবজনিত মর্মবাণীতে পৌঁছাতে পেয়েছিল। প্রভেদটা সত্যিই মূলের যা ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নি।

স্বাভাবিকভাবেই এই নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীর সর্বত্র নিপীড়িত শোষিত মানুষকে প্রভাবিত করেছে। ভারতবর্ষও এই প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে নি। অবশ্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ নভেম্বর বিপ্লবের ভাবধারা যাতে এখানকার মানুষকে প্রভাবিত করতে না পারে, মার্কসবাদী চিন্তার বীজ এই দেশে যাতে কোন ফসল ফলাতে না পারে তার জন্য বিধিবাধা নিষেধের বেড়াজাল তৈরি করে রেখেছিল। কিন্তু চিন্তাভাবনা মতাদর্শ ইত্যাদির প্রসারকে বন্ধ করা খুব সহজ নয়।

প্রাচীর ডিঙিয়ে, বেড়াজাল ভেদকরে, নিষেধের সঙ্গিনকে উপেক্ষা করে সে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিগন্তে। তাই ভারতবর্ষেও মার্কসবাদী চিন্তাধারা, নভেম্বর বিপ্লবের প্রেরণাময়ী ঘটনার প্রভাব ঠেকান গেল না। গোপন পথে এই সব চিন্তা ধারনা আমদানি হতে থাকল।

১৯২০ সালে তাসখন্দে অর্থাৎ বিদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হোল স্বাধীনতার নেশায় পাগল তথা সমস্ত বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যুবকেরা গোপন পথে রাশিয়ায় চলে গেলেন। যেখানে মার্কসবাদ বা বিপ্লবের তত্ত্ব শিক্ষার স্কুলে তাঁরা যোগ দিলেন এবং সেখান থেকে শিক্ষিত হয়ে ফিরে এলেন। ঐ বছরেই ভারতের প্রথম সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তৈরি হল। এই সংগঠনের নাম হল অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। যদিও এই সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ার বাহ্যিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা



কলকারখানা জাতীয়করণ করা হচ্ছে

যাবে যে যাঁরা এর উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁরা ঠিক মার্কসবাদী চিন্তার শরিক ছিলেন না, তবু একথা আজকোন মতেই অস্বীকার করা যাবে না যে কয়বছর আগে অর্থাৎ ১৯১৭ সালে সংগঠিত রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব গোপনে তার বাস্তবভিত্তি তৈরি করেছিল।

মোটামুটি এই সময়কালেই অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ছাড়াও অন্যান্য স্তরের সংগঠনগুলি তৈরি হোতে শুরু হল। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন হিসাবেই তৈরি হল। কিন্তু কলে কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ছাড়াও ততদিনে ভারতবর্ষে আরও বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর জন্ম হয়েছে, যাদের বলা চলে মধ্যবিত্ত কর্মচারী। এঁরা স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি বেসরকারি অফিসে কাজ করেন। এদের মধ্যেও এই সময় সংগঠন তৈরি করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠন তৈরি হল।

এইসব সংগঠনের সেদিনকার নথিপত্র ঘাটলে দেখা যাবে যে সেখানে মার্কসবাদ বা নভেম্বর বিপ্লবের কোন কথাই বলা নেই এবং সব এমনভাবেই রয়েছে যাতে মনে হবে যে এই সব কার্যকলাপের সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তা ধারনার দূরতম সম্পর্কও নেই এটা অবশ্যই ঠিক যে তখনকার অবস্থায় মার্কসীয় চিন্তাধারা ভারতবর্ষে সবে প্রবেশ করতে শুরু করেছে বাধা নিষেধের বহু গণ্ডী অতিক্রম করে। কাজেই তার প্রভাব মোটেই ব্যাপক ছিল না। কিন্তু গভীর অভিনিবেশ সহকারে তখনকারে সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত সেদিনকার সংগঠন ইত্যাদি গড়ার পেছনে কাজ করেছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের সরাসরি ও প্রত্যক্ষ আক্রমণের হাত এড়াবার কৌশল হিসাবে এবং তদানিন্তন কর্মচারি মানসিকতার বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই তখন এইভাবে চলতে হয়েছিল।

এর পর পাশ্চাত্যের উন্নত ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সমস্ত অপ-প্রচারকে ভুল প্রমানিত ককে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাশিয়া অর্থনীতি ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটাল। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হোল সেই রাষ্ট্র বিশ্বের প্রথম একক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়াতে একে ধ্বংস করার জন্য পুঁজিবাদী দুনিয়ার পক্ষ থেকে ব্যাপক

ও ক্রমাগত আক্রমণ পরিচালিত হতে থাকল। এই ভাবে শত্রুপরিবেষ্ঠিত পৃথিবীতে এককভাবে সোভিয়েত রাশিয়াকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ ধরে চলতে হল। দেখা গেল ধনতান্ত্রিক দুনিয়া আর সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রভেদ আকাশ পাতাল। ধনবাদী দুনিয়ার যেখানে সাধারণ মানুষের জন্য শোষণ, অত্যাচার, অনাহার দুর্ভিক্ষ বেকারী, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় সেখানে এই সব সামাজিক ব্যাধির কোন স্থান নেই। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কয়েকশ' বছরের সাধনায় বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি ঘটাতে পেরেছে কয়েক দশকের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া সেই জায়গায় পৌঁছে গেল— অনেকক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে পেছনে ফেলে দিল। ফলে আমাদের দেশের বেশী বেশী মানুষ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত দেশের প্রতি আকৃষ্ট হল, নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য উপলব্ধি করল। নভেম্বর বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়া মার্কসবাদী তত্ত্বের সফল বাস্তব প্রয়োগ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার অপ্রতিহত, অবিশ্বাস্য ও অভূতপূর্ব অগ্রগতি তাই শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষের কাছে মার্কসবাদকে পরিচয় করিয়ে এবং এই দর্শন ও তত্ত্বের অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠা করে দিল। মার্কসবাদী তত্ত্বে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠারক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর দায়িত্ব অপসিসীম এবং এই শ্রেণীকেই ভাঙা ও গড়া এই উভয় দায়িত্ব পালনের জন্য সক্রিয় হতে হবে।

সোভিয়েত রাশিয়া আরও যা শেখাল তা হোল শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা। এরই সুফল আমাদের দেশে আমরা দেখতে পেলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। হিটলারের নেতৃত্বে নাজিবাহিনী যখন রাশিয়া আক্রমণ করল তখন আমাদের দেশের কমিউ-নিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হোল যে যুদ্ধের চরিত্র পাল্টে গেছে, যুদ্ধ এখন ফ্যাসি-বাদেয় আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করার দায়িত্বে পর্যবসিত হয়েছে। তাই দেশের সমস্ত মেহনতী মানুসের কর্তব্য হোল এই যুদ্ধে মিত্র পক্ষ যাতে জয়ী হতে পারে এবং ফ্যাসিবাদ যাতে পরাজিত হতে পারে তার জন্য সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা করা। সেদিনকার বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদী হিটলারের বিশ্বজুড়ে বর্বর ফ্যাসিষ্ট রাজত্ব কায়েম করার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গী যে কত সঠিক ছিল যুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। দেশের মানুষের শত্রুরা সেদিন এই দৃষ্টিভঙ্গীকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল, আজও তারাই বেশ ধরে শাসক শ্রেণী, মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। সোভিয়েত রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব এবং বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াই বিশ্বের মানুষের কাছে রাজনীতির ঘটনাকে সঠিকভাবে বোঝার উপলব্ধি পৌঁছে দিয়েছিল।

বিপ্লবের মত আলোড়নকারী ঘটনার প্রভাব ঠিক এক-দুই-তিন এই ভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। 'নভেম্বর বিপ্লব' সম্বন্ধে একথা আরও বেশী সত্য কারণ, আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর দেশে দেশে কোটি কোটি নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের কাছে এই বিপ্লব ছিল আশার আলো, জীবনের জয়গান, দুঃখ কষ্ট অত্যাচার অপমান লাঞ্ছনার অবসানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যাতাকলে যে সব দেশের মানুষ পিষ্ট হচ্ছিলেন, তাঁদের কাছে এই বিপ্লবের ছিল আরও গভীর তাৎপর্য। ভারত-বর্ষের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এই স্বল্প পরিসরে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু বলা যাবে না। তবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁদের মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রশ্নের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, শ্রমিক শ্রেণীত বটেই, সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষেত্রে সংঘঠিত ভাবে লড়াই করার জন্য নভেম্বর বিপ্লব আমাদের পথের আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করেছে। শুধু তাই বা কেন? কে জানে সফল নভেম্বর বিপ্লব যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সূচনা না করত, সমাজের অগ্রগতি আরও কত বিলম্বিত হোত, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনই কি ১৯৪৭ সালে সম্ভব হোত? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের পতন, ফ্যাসিবাদের পরাজয় এদেশের শাসক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকে ত্বরান্বিত করেছে এ সম্বন্ধে ত' কোন সন্দেহ নেই। আর এর চাইতে আরও সন্দেহাতীত ত' এই ঘটনা যে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটান সম্ভব ছিল না যদি না সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর দাড়িয়ে, সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ মানুষের অভাবনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল মরণপণ সংগ্রামে ঝাপিয়ে পরত।

লাল-ফৌজ



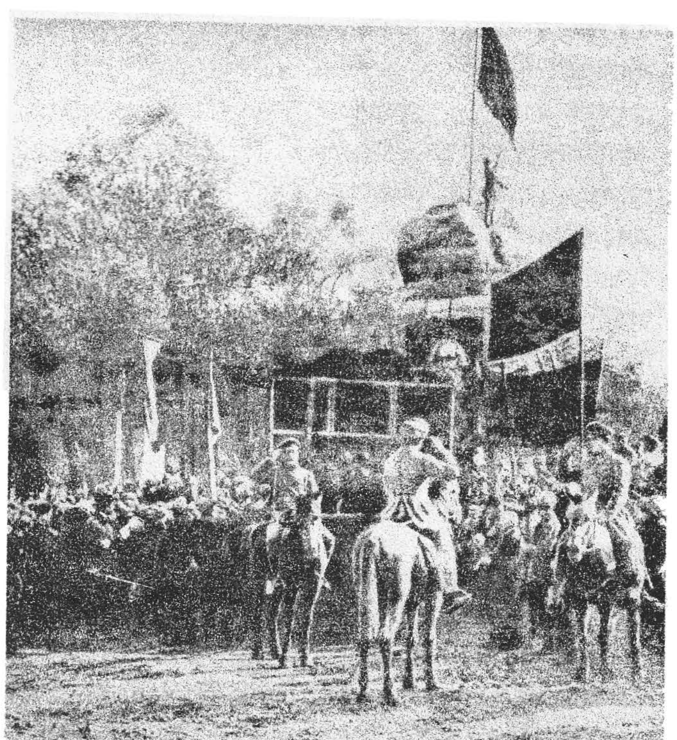
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি দমনে নভেম্বর বিপ্লবের অবদান

মনোরঞ্জন বড়াল

বর্তমান বৎসরের (১৯৮২'র) ৭ নভেম্বর মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৬৫তম বার্ষিকী দিবস। রুশিয়ার স্বৈরাচারী জার শাসিত বিশাল সাম্রাজ্যে চরম শোষণের অবসান ঘটিয়ে নভেম্বর বিপ্লব যে মানবজাতির অগ্রগতির পথে নতুন পর্বের সূচনা করেছে তা গত ছয় দশকাধিক কাল ধরে প্রতিবৎসরই প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৮২ সালটি নভেম্বর বিপ্লবোত্তর বিশাল ভূখণ্ডে অন্য আর একটি কারণে ৬০তম বার্ষিকী হিসাবেও উল্লেখ-যোগ্য। ১৯২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গঠিত হয়েছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের ইউনিয়ন (ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক—ইউ এস এস আর)। সহজবোধ্য ভাষায় সোভিয়েত ইউনিয়ন।

নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তী পাঁচ বৎসরে লেনিন পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন গড়ে ওঠে তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে। একটি বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির স্বেচ্ছাকৃত মৈত্রীর নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল এই সব প্রজাতন্ত্রের সমগ্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা থেকেই। এর পথ তৈরী হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের সঠিক জাতি সংক্রান্ত কর্মনীতি দ্বারা। বাইরের ও ভিতরকার বিভিন্ন চরিত্রের অসংখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির মিলিত সংগ্রাম ক্ষেত্রে অনুধাবন করা গিয়েছিল যে, সোভিয়েত শাসনের প্রথম বৎসরগুলিতে তাদের মধ্যে যেসব চুক্তি-সম্পর্ক ছিল সে সব দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য এবং সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট ছিল না।

প্রসঙ্গত পূর্বকথা স্মরণীয়। মহান নভেম্বর বিপ্লবের পর কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সরকার সদ্য ক্ষমতাচ্যুত জারতন্ত্রের জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের জেরগুলির সম্মুখীন হয়। জার রাশিয়ায় বসবাসকারী অরুশ জাতিগুলি বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়েছিল। আর এই অ-রুশ জাতিগুলিই ছিল সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী। মধ্য এশিয়ায়, কাজাকস্তানে ট্রান্সককেশাস বহু অঞ্চলের প্রত্যন্ত প্রদেশ সমূহে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের প্রাধান্য ছিল। ঐসব স্থানের অধিকাংশ লোকই শিক্ষক, ডাক্তার ধরনের লোকদের কখনো চোখে দেখেনি। স্থানীয় শোষকরা এবং রুশ জমিদার ও পুঁজিপতিরা তাদের উপর শোষণ চালাত। অর্থনৈতিক দিক থেকেও প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি ছিল নিঃস্ব। শিল্প কলকারখানা, যানবাহন-পরিবহণ ব্যবস্থা বলে প্রায় কিছুই ছিল না। অনেকগুলি জাতি যাপন করত যাযাবর জীবন। বৃহত্তম অংশ লোকই ছিল



১৯১৭ সালে তাসখন্দে সোভিয়েত ক্ষমতা দখলের ঘোষণা পতাকা উত্তোলন

দরিদ্র ও নিররক্ষ। তাজিক সাহিত্যিক আইনির ভাষায়ঃ এখানে লেখাপড়া জানা লোক মরুভূমিতে সবুজ ঘাসের মতই বিরল।

"বিভক্ত ক'রে শাসন করো" (ডিভাইড্ অ্যাণ্ড রুল) এটাই ছিল জারতন্ত্রের নীতি। পারস্পরিক জাতীয় শত্রুতা দমন করা হত না, বরং নানাভাবে বৃদ্ধিই করা হত। বিভিন্ন অঞ্চলে ইহুদী-নিধন আন্দোলন, ট্রান্সককেশাসে মারামারি-কাটাকাটি, ভোলগ্ অঞ্চলে 'বিজাতীয়দের' উপর নিপীড়ন অত্যাচার লেগেই ছিল। লেনিনের ভাষায়ঃ জার রাশিয়া ছিল জাতি সমূহের জেলখানা। তাই লেনিন ও তার সহ-সংগ্রামীরা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রথম থেকেই জাতীয় প্রশ্নের প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাদের স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল—সকল প্রকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং শোষণমুক্ত নতুন সমাজ ব্যবস্থার জন্য সংগ্রামে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল মেহনতী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা। তারা সব সময়েই মনে করেছেন যে, জাতিবর্ণ বিভেদের প্রশ্নটির মীমাংসা করতে হবে শ্রেণী সংগ্রামের আলোকে, বিপ্লবের স্বার্থে ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থে।

লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিটি জাতিকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণদানের স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। উগ্র জাতীয়তা-বাদের সমালোচক হিসাবে কমিউনিস্ট নির্যাতনকারী জাতীর ও নির্যাতিত জাতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটা সীমারেখা বরাবরই নির্ধারণ করেছেন। সকল জাতির শ্রমিক ও মেহনতী মানুষদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ জোট গঠনে প্রয়াসী হয়েও কমিউনিস্টরা যে—কোন প্রকারের বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থেকেছেন। তাদের নীতি ছিল—জোট গঠিত হওয়া উচিত এবং গঠিত হতে পারে কেবল স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে। নভেম্বর বিপ্লবের বিজয়ের পরে সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কর্মনীতির উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবে রূপ দেবার পক্ষে এই বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল।

নভেম্বর বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্যের পরই ৭ ও ৮ নভেম্বর 'ভূমি ও শান্তি' বিষয়ক ডিক্রি গ্রহণ করা হয়। মাত্র সপ্তাহকাল পরে ১৫ নভেম্বর জন-কমিসার পরিষদ কর্তৃক রাশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা প্রচার করা হয়। তাতে ঘোষিত হয়ঃ

> রাশিয়ার জাতিসমূহের সম-অধিকার ও সার্বভৌমত্ব, জাতিসমূহের স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (ইচ্ছা করলে তারা রাশিয়া থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রও গঠন করতে পারে); সমস্ত ও সকল প্রকারের জাতীয় এবং জাতীয়-ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা ও বাধানিষেধ বাতিল; সংখ্যালঘু জাতিগুলির স্বাধীন বিকাশ; রাশিয়ার জাতি-সমূহের স্বেচ্ছামূলক ও সততাপূর্ণ জোট গঠন এবং তাদের পূর্ণ পারস্পরিক আস্থার প্রয়োজনীয়তা।

জাতিগত প্রশ্নে তত্ত্ব কথা নয়, এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট কর্ম-নীতি বাস্তবে রূপদানের দায়িত্ব এসে পড়ল গৃহযুদ্ধ ও বহু রকমের সমস্যার সম্মুখীন দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর। ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'সোভিয়েত সমূহের তৃতীয় সারা রুশিয়া কংগ্রেসে' লেনিন বলেনঃ আমরা শাসন, কার্য সম্পাদন করছি সকল মেহনতী মানুষের তাদের নিজেদের জীবন্ত স্বার্থ ও শ্রেণী চেতনার অবিচ্ছেদ্য শৃংখলের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ক'রে, প্রাচীন রোমের কঠোর নিয়মানুসারে বিভক্ত করে নয়। যে বল প্রয়োগের ক্ষমতা মিথ্যা কঠোরতা দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কৃত্রিম রাষ্ট্রীয় গঠন সমূহের সংযোজন সাধন করে থাকে সেই বল প্রয়োগের ক্ষমতার চেয়ে আমাদের জোট, আমাদের নতুন রাষ্ট্র দৃঢ়তর।

নভেম্বর বিপ্লবের পর প্রাক্তন জার সাম্রাজ্যের অধীন সকল জাতি নিজেরা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ পেল। ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করল। সোভিয়েত সরকার ঘোষিত জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এর মধ্য দিয়ে বাস্তবে রূপ পেল। স্বনির্ভর সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি গঠিত হল। রাশিয়া প্রজাতন্ত্র ছিল ইতিহাসের প্রথম বহুজাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্র। স্বাধীন জাতিসমূহের স্বাধীন জোটের ভিত্তিতে ফেডারেশন হিসাবেই গঠিত হয়েছিল এই প্রজাতন্ত্র। অনুরূপ ধরনের পরবর্তী দুটি প্রজাতন্ত্র হল—ইউক্রেন ও বেনোরুশিয়া প্রজাতন্ত্র। তারপরে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া প্রজাতন্ত্র। শেষোক্ত তিনটি ট্রান্সককেশীয় প্রজাতন্ত্র অল্পদিনের মধ্যেই একটি ফেডারেশনে সম্মিলিত হয়। এর পরে বিভিন্ন জাতির স্বায়ত্ত শাসিত রাষ্ট্রীয় গঠনও দেখা দিতে আরম্ভ করে কিন্তু অভ্যান্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতিবিপ্লব সোভিয়েত সরকারগুলিকে শান্তিপূর্ণ দেশ পুনর্গঠনের সুযোগ দেয়নি। তা সত্ত্বেও প্রাক্তন জার রাশিয়ার বিভিন্ন জাতির মেহনতী মানুষেরা উপলব্ধি করতে পেয়েছিলে—নসোভিয়েত শাসন তাদের কতটা কি মঙ্গল করেছে এবং আন্তরিকভাবে মঙ্গলসাধনে কতখানি প্রয়োসী। তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা—পুঁজিপতি ও জমিদারদের অত্যাচারের অবসান ঘটছে, কলকারখানাগুলি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। কৃষকদের জমি দেওয়া হচ্ছে,. হাজার হাজার দৃষ্টান্তে প্রতিটি জাতির জাতীয় অনুভূতির বিবেচনায় কমিউনিস্টদের ধৈর্য ও নম্রতার পরিচয় পাচ্ছে।

বহুজাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠনে অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল রুশ শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ। তৎকালীন পেত্রগ্রাদ (বর্তমান লেনিনগ্রাদ), মস্কো, নিজনি-নভগরোদ, ইভানোভো-ভজনেসেনস্ক প্রভৃতি রাশিয়ার প্রতিটি শিল্পকেন্দ্রের শ্রেণী সংগ্রাম সচেতন শ্রমিকদের নিঃস্বার্থ বীরত্ব যে কোন নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে তাদের আপসহীন সংগ্রাম সকল জাতির মেহনতী মানুষদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, রুশ শ্রমিকদের, কমিউনিস্টদের ও লেনিনের নেতৃত্বকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা যায়, তাদের উপর নির্ভর করা যায়। তাই দৃঢ়ভাবেই বলা যায়, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র-গুলির ইউনিয়ন গঠনের ঐতিহাসিক কার্যক্রমের প্রস্তুতি হয়েছিল নভেম্বর বিপ্লবের সমগ্র ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে। রাশিয়ায় বসবাসকারী সকল জাতির স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের যুক্তিসঙ্গত সুফল ছিল এই ক্রমবিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ঐক্যবদ্ধ এক ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠনের পিছনে অন্যতম অভ্যন্তরীণ কারণ ছিল—সুদৃঢ় জোট ব্যতিরেকে সামরিক ঝড়ঝাপ্টা এবং গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ সৃষ্ট মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দেশ পুনর্গঠনের কাজ ছিল অসম্ভব, বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক আক্রমণ ও হস্তক্ষেপের হুমকিকে পরাস্ত করে সোভিয়েত ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা, রক্ষা করা ও ক্রমশক্তিশালী করা সম্ভব ছিল না।

প্রায় পূর্ণ পাঁচ বৎসর কাল নতুন ধরনের বিপ্লব ও সোভিয়েত রাষ্ট্র পরিচালনার পর ১৯২২ সালের ২৬ অক্টোবর লেনিন লিখলেন ঃ

> "আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের মনে এই অটল বিশ্বাস উৎপাদন করেছে যে, বিভিন্ন জাতির স্বার্থের প্রতি বিপুল মনোযোগই কেবল সংঘর্ষের কারণ দূর করে, পারস্পরিক অনাস্থা দূর করে, আস্থা সৃষ্টি করে, বিশেষত বিভিন্ন ভাষাভাষী শ্রমিক ও কৃষকদের আস্থা–যা ব্যতিরেকে জাতিসমূহের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক, আধুনিক সভ্যতার মূল্যবান যা-কিছু আছে তার কোন সফল বিকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

প্রাক্তন জার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিরাট ভূখণ্ডের সর্বত্র নভেম্বর বিপ্লবের জয়যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যেমন প্রয়োজন ছিল রাশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার ঘোষণাপত্র প্রচার করা, তেমনই বাস্তব অভিজ্ঞতায়ই প্রয়োজন হয়ে পড়ল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন করা। ১৯২২ সালের প্রথম থেকেই একটি একক ইউনিয়ন রাষ্ট্রে মৈত্রীবদ্ধ হবার জন্য সকল প্রজাতন্ত্রের মেহনতী জনগণের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সংগঠিত হতে থাকে। ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশন গঠিত হয় ১৯২২ সালের মার্চে এবং ডিসেম্বরে তা আবার পুনর্গঠিত হয় ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্ররূপে। ইউক্রেনীয়, বেলরুশীয় ও ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সোভিয়েত কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২২ সালের ডিসেম্বর। এই কংগ্রেসে ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯২২ সালের ২৬ ডিসেম্বর দশম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে একটি একক ইউনিয়ন রাষ্ট্রে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির একীকরণের সময়োপযোগিতা স্বীকার করা হয়।

একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনে লেনিন ও কমিউনিস্ট পার্টিকে রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রশ্নে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়নি। ইউনিয়ন গঠন আন্দোলন কালে লেনিনকে "বড় রুশী" (বিগ রাশিয়ান) উগ্রজাতিবাদ ও স্থানীয় জাতীয়তবাদের বিরুদ্ধে, প্রশাসনিক জবরদস্তি ও বলশেভিক পার্টির জাতীয় কর্মনীতির অন্যান্য বিকৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম করতে হয়। ১৯২২ সালের নভেম্বরে মস্কো সোভিয়েতের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে লেনিন সোভিয়েত শাসনের পাঁচ বৎসরের ফলাফলের সারমর্ম ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ কোন সন্দেহ নেই যে, অর্থনৈতিক কর্মনীতির রাশিয়া হয়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া। ঐ বৎসর শরৎ-কাল থেকে লেনিন গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ৩০ ডিসেম্বর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের মস্কো সম্মেলনেও উপস্থিত থাকতে পারেননি। রোগে শয্যাশায়ী অবস্থায়ও তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ও প্রবন্ধ লেখেন ঃ 'কংগ্রেসের নিকট পত্র' (ইচ্ছাপত্র' নামে পরিচিত), 'রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনকে বিধানিক অধিকার' মঞ্জর করা প্রসঙ্গে, 'জাতিসত্তার প্রশ্ন অথবা স্বায়ত্ত শাসনীভূতি' 'দিনলিপির পাতা', 'সমবায় প্রসঙ্গে', 'আমাদের বিপ্লব', 'বরং অল্প কিন্তু উন্নততর' প্রভৃতি। এই সব রচনায় তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে বিভিন্ন সমস্যা ও সে সবের সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন।

সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতাই 'স্বায়ত্ত শাসনীভূতি' পরিকল্পনার এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল—রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে স্বায়ত্ত শাসিত ইউনিট হিসাবে ইউক্রেন, বেলোরুশীয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানকে যুক্ত করা হবে। এই পরিকল্পনার পরিবর্তে লেনিন নতুন ধরনের একটি রাষ্ট্র সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের নীতি

কাঠামো উপস্থিত করেন। তিনি "বৃহৎশক্তি" ("বড় রুশী") জাতিবাদ ও স্থানীয় জাতীয়তাবাদ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন।

মস্কোয় বৃহৎ ক্রেমলিন প্রাসাদের আন্দ্রেয়েভ হলে রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ট্রান্সককেশীয় ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং বেলোরাশিয়া সোভিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত সমূহের কংগ্রেসগুলি দ্বারা নির্বাচিত অধিকার প্রাপ্ত প্রতিনিধি দলগুলির একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ১৯২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর জানা যায়। ইউনিয়ন গঠনকারী প্রজাতন্ত্রগুলি থেকে সোভিয়েত সমূহের প্রথম কংগ্রেসে বলকয় থিয়েটারে উপস্থিত ছিলেন ২২১৪ জন প্রতিনিধি। এদের মধ্যে ১৬৭৩ জনের ছিল নির্ধারক ভোট দানের অধিকার এবং বাকীদের ছিল পরামর্শ দানের অধিকার।

প্রতিনিধিদের মধ্যে ৭১০২ শতাংশ ছিলেন শ্রমিক কৃষকের সন্তান, বাকীরা ছিলেন বুদ্ধিজীবী, সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারি। বেশীর ভাগ প্রতিনিধিই ছিলেন বয়সে তরুণ। তাদের মধ্যে ৯০.১ শতাংশের বয়স ছিল তখন ৪০ বৎসরের ও নিচে এবং ৪৬.২ শতাংশের বয়স ছিল ৩০ বৎসরের ও কম।

প্রতিটি প্রজাতন্ত্র থেকে একজনকে নিয়ে চারজন সদস্যের এক সভাপতি মণ্ডলী সম্মেলনের জন্য নির্বাচিত হয়—রাশিয়া থেকে কমরেড কালিনিন, ইউক্রেন থেকে কমরেড পেত্রোভস্কি, ট্রান্সককেশীয় প্রজাতন্ত্র থেকে কমরেড সখাকায়া এবং বেলোরাশিয়া থেকে কমরেড চেভিয়াকোভ। কর্মসূচীতে ছিল ঃ ১) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়ন গঠনের বিষয়ে ঘোষণাপত্র এবং ইউনিয়ন চুক্তি পর্যালোচনা, এবং ২) সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের ইউনিয়নের সোভিয়েত সমূহের প্রথম কংগ্রেসের কর্মসূচি ও উদ্বোধন তারিখ। সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের খসড়া এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সমূহের মধ্যে চুক্তির গঠিত হয়। এই খসড়াগুলি অবশ্য পূর্বেই বিভিন্ন প্রতিনিধি দল কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছিল।

ঘোষণাপত্র ও চুক্তি স্বান্দরের কাজ স্বাক্ষরের হয় ৩০ ডিসেম্বর সকালবেলা। সোভিয়েত সমূহের প্রথম কংগ্রেসের কর্মসূচি আলোচিত হয় এবং ঐ দিন বেলা ১১টায়। বলশয় থিয়েটারে সেই কংগ্রেস আহ্বান করা হয়। কংগ্রেসের অনুমোদিত কর্মসূচি অনুসারে সর্বপ্রথমে মঞ্চে উঠলেন সর্ব-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য পিওতর স্মিদোভিচ। তিনটি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী এই বিপ্লবীকে অভ্যর্থনা জানান প্রতিনিধি ও অতিথিরা। স্মিদোভিচ ১৮৯৮ সাল থেকে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তুমুল করতালির মধ্যে তিনি সোভিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেস উদ্বোধন করেন। বহুজাতিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন ১৩ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের বহুদিনের অভিপ্রায় বাস্তবে রূপ পাবার কথা বক্তাদের একের পর এক ভাষণে শোনা যায়।

প্রথম সোভিয়েত গণ-কমিশনারদের মধ্যে জোসেফ স্তালিন ছিলেন জাতিসমূহ বিষয়ক গণ-কমিশনার। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করে বলেন ঃ সোভিয়েত ক্ষমতার ইতিহাসে ৩০ ডিসেম্বর হচ্ছে অতি গুরুত্ব-পূর্ণ একটি দিন। এই দিন পুরানো অতিক্রান্ত কাল (যখন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি এক সঙ্গে কাজ করলেও বিভিন্ন পথে চলছিল) এবং নতুন কালের মধ্যে (যখন জাতীয় অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য, প্রজাতন্ত্র সমূহের সামরিক ক্ষমতা; ফিনান্স ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাগুলি একত্রিত করনের জন্য এবং সেগুলিকে মেহনতী মানুষদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম বড় এক শক্তিতে পরিণত করণের জন্য সমস্ত প্রয়াসের সমাবেশ ঘটানো হচ্ছে) এক যোগসূত্র সৃষ্টি করছে।

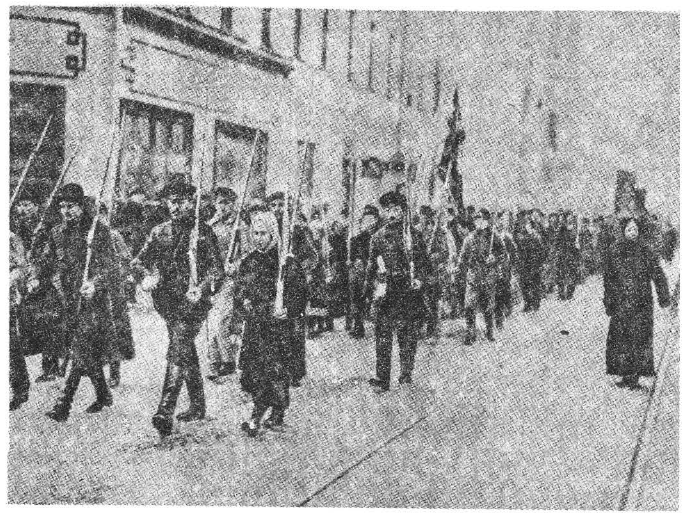
এরপর স্তালিন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের ইউনিয়ন গঠনের ঘোষণাপত্র ও চুক্তির শর্তগুলি প্রতিনিধিদের পাঠ করে শোনান এবং এইগুলি মতৈক্যের সঙ্গে গ্রহণের কথা বলেন। আলোচনার প্রথমে অংশগ্রহণ করেন প্রখ্যাত বিপ্লবী ও গৃহযুদ্ধের বীর সেনাপতি মিখাইল ফ্রুঞ্জে। তিনি ঘোষণা-পত্র ও চুক্তির পাঠগুলি অনুমোদন করার প্রস্তাব রাখেন। এর পর একদিকে ভাষণ চলতে থাকে এবং অন্যদিকে প্রতিনিধি দলগুলির নেতারা, দলিল সমূহে স্বাক্ষর দিতে থাকেন। বিরতির পর কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধি দলের নেতারা প্রত্যেকেই উদাত্ত ভাষণ দেন এবং বলেন, সোভিয়েত দেশের জীবনে এই দিনটি নিঃসন্দেহেই এক মহান পদক্ষেপ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হবার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় 'কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩৭১ জন কমিটির সদস্য ও ১৩৮ জন প্রার্থী সদস্য নির্বাচিত হন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনে উৎসস্থল থেকে আসা লোক। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন জনগণের জীবনের সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচিত ব্যক্তিরা—শ্রমিক, কৃষক, জনশিক্ষক আর সৈনিকরা। এরা গণ-ক্ষমতার বিজয়ের জন্য লড়েছিলেন। তারাই ছিলেন ঐক্যবদ্ধ বহুজাতিক রাষ্ট্র

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মূলশক্তি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন বিষয়ক ঘোষণাপত্রে বলা হয়ঃ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি নিজেদের সোভিয়েত সমূহের কংগ্রেসগুলিতে সমবেত হয়ে সর্ব সম্মতিক্রমে 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের ইউনিয়ন' গঠনের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সমূহের জাতিগুলির অভিপ্রায় এই নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি দেয় যে এই ইউনিয়ন হচ্ছে সমানধিকার সম্পন্ন জাতি সমূহের স্বেচ্ছাকৃত মিলন, ইউনিয়ন থেকে প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনভাবে বেরিয়ে যাবার অধিকার থাকবে, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সকল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার আছে, নতুন ইউনিয়ন রাষ্ট্রে সেই ১৯১৭ সালের অক্টোম্বরে জাতি সমূহের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতার যে নীতিগুলি গৃহীত হয়েছিল তার সফল বাস্তবায়ন ঘটবে।...... সমগ্র বিশ্বকে এসব কিছু জানিয়ে এবং আমাদের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্তকারী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সমূহের সংবিধানগুলিতে উল্লিখিত সোভিয়েত ক্ষমতার মূলনীতি সমূহের অটলতার কথা ঘোষণা ক'রে আমরা এই সমস্ত প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিরা, প্রাপ্ত পূর্ণাধিকারের ভিত্তিতে, 'সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের ইউনিয়ন' গঠনের বিষয় চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তী গৃহযুদ্ধ ও ১৫টি রাষ্ট্রের বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অবসানের পর গঠিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্র। এরপর মাত্র ১৯টি বৎসর সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত থাকতে পেয়েছিল। ১৯৪১ জুন মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ে এই দেশ। হিংস্রতম হিটলারী ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনকে পরাজিত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়ী হয়। বহুজাতির দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ রণক্ষেত্রে ও সমগ্র দেশ জুড়ে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী এবং কঠোর সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষা ঐক্যের যে বিস্ময়কর পরিচয় দেয় তার কোন পূর্বনজির ইতিহাসে ছিল না। নাৎসী জার্মানি প্রাথমিক বিজয় পর্বে অধিকৃত সোভিয়েত এলাকায় একটিও তাবেদার সরকার খাড়া করতে পারেনি। সোভিয়েতের কোন অঙ্গ রাজ্যই এই কঠোর দিনগুলিতেও ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কোন পরোক্ষ ইঙ্গিতও দেয়নি। পিতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করা এবং দেশপ্রেমিক যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল প্রতিটি অঙ্গ প্রজাতন্ত্রে।



৭ নভেম্বর ১৯১৮ সাল। সশস্ত্র শ্রমিক মিছিল

নভেম্বর বিপ্লবের ৬৫তম বার্ষিকী এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ৬০তম বার্ষিকী দিবসের প্রাক্কালে সংক্ষেপে এই দেশের পরিচয় নিম্নরূপঃ

সোভিয়েত ইউনিয়ন হল ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পৃথিবীর বৃহত্তম এই দেশের আয়তন ২ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা পৃথিবীর জনবসতি ভূভাগের একষষ্ঠাংশ। ইউরোপের পূর্বাংশ এবং উত্তর ও মধ্য এশিয়া জুড়ে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিস্তৃতি পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫ হাজার কিলোমিটার এই দেশের তটভূমি ১২টি সাগর ও অতলান্তিক, সুমেরু ও প্রশান্ত এই তিনটি মহাসাগর বিধৌত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কো। বর্তমানে এই ইউনিয়নে ১৫টি অঙ্গ প্রজাতন্ত্র, ২০টি স্বায়ত্ত শাসিত প্রজাতন্ত্র, ৮টি স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল ও ১০টি স্বায়ত্ত শাসিত এলাকা। সোভিয়েত ইউনিয়নে বাস করে ১০০-র বেশী জাতি-অধিজাতি। দেশের মোট জনসংখ্যা (১৯৮২ সালের শুরুতে) ২৬ কোটি ৮৮ লক্ষ। শহরের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ, গ্রামীণ জনসংখ্যা ৩৬ শতাংশ।

পুরুষ মোট জনসংখ্যার ৪৬.৮ শতাংশ, নারী ৫৩.২ শতাংশ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক বনিয়াদ হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভিত্তি হচ্ছে উৎপাদনের উপায়ের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা। রাষ্ট্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে জারের রাশিয়া তার বিরাট ঔপনিবেশিক এলাকা নিয়ে তৎকালীন মিত্র পক্ষে যোগ দিলেও কাইজারের জার্মানির সেনা বাহিনী পূর্ব দিকে রাশিয়াকে যে ভাবে বিপর্যস্ত করেনি তাতে বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত—যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই ঐ দেশে মহান নভেম্বর বিপ্লব সাফল্য মণ্ডিত না হত। নভেম্বর বিপ্লবও যুদ্ধ পূর্ব রুশিয়ার ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া ঠেকাতে পারত না—যদি নভেম্বর বিপ্লব সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়ার জাতি সমূহের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা প্রচারনা করা হত। বহুজাতির দেশ রুশিয়ার জাতিগত প্রথম বিপ্লব বিজয়ী কমিউনিস্ট পার্টি ও তার প্রধান নেতা লেনিনের সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি সত্ত্বেও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে প্রতি বিপ্লবীরা ঘাটি গেড়ে ছিল এবং স্থানীয় সামন্তবাদী শক্তিগুলি ও হস্তক্ষেপকারী বিদেশী পুঁজিবাদী শক্তিগুলির সহযোগীতা সন্ধানের জন্য সোভিয়েত বিরোধী ষড়যন্ত্র সফল করেছিল। ১৯২১ সালে গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অবসান না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ধন ও জনের বহু ক্ষয়ক্ষতি করেছে।

বিপ্লবী গঠন কার্যে শান্তিপূর্ণ আত্মনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া মাত্রই ১৯২১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শতাধিক জাতি-অধিজাতির দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন কায়েমী স্বার্থবাদ, "বড়জাতি" উগ্রজাতি বাদ, স্থানীয় জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিক বৈষম্য, ধর্মভিত্তিক বৈষম্য প্রভৃতির মূলে কুঠারাঘাত করে ও সমূলে উচ্ছেদ করে বিচ্ছিন্নবাদী শক্তি ও চিন্তাধারার চির অবসান ঘটিয়েছে।

বহুজাতি-অধিজাতি ও বিরাট জনসংখ্যার দেশ ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরও বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রতিক্রীয়াশীল শক্তিগুলি কেন ক্রমান্বয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে এবং স্বাধীনতা লাভের সাড়ে তিনদশক পরেও কেন সব অশুভ শক্তি দেশের স্বাধীনতা, সংহতি ও ঐক্যকে দারুণ ভাবে বিপন্ন করতে পারছে, আর নভেম্বর বিপ্লবের পর মাত্র পাঁচ বৎসরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত রুশিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী অশুভ শক্তিগুলিকে কিভাবে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছিল—শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ভারতবাসীকে সে সব খতিয়ে বিচার করতে হবে।

যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে সংবাদ ঃ শিল্পী জুকভ্



নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব ও বাংলা সাহিত্য

প্রভাতকুমার গোস্বামী

মানব সভ্যতার হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে দেখা যায় প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু বিদ্রোহ-ই শেষ নয় বার বার নির্যাতিত মানুষ বিপ্লবও করেছে এবং এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লব গোটা ইউরোপের ভিত্তি ভূমিকেই নাড়া দিয়েছিল-পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিল স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর বাণী।

এর পরে এই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের নভেম্বর বিপ্লব রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সেই বিপ্লবের চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক। এই বিপ্লব রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটায়। এই বিপ্লব একই সঙ্গে প্রচালিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উপরি সৌধের ওপরে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। জোসেফ স্তালিনের ভাষায়—"নভেম্বর বিপ্লবকে একটি দেশের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। মূলতই এটি আন্তর্জাতিক বিপ্লব। কারণ, এই বিপ্লব মানব সমাজের ইতিহাসে একটি মূলগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই বিপ্লব পুরানো ধনতান্ত্রিক জগৎকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় পরিবর্তিত করেছে।"

এই জন্যই এই বিপ্লবের ঢেউ এসে লাগে অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষের তটপ্রান্তে। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন: একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যাঁতা কলে পিষ্ট অন্যদিকে দেশীয় ও বিদেশীয় ধনিক শ্রেণীর শোষণে জর্জরিত। রুশ বিপ্লব তাই ভারতবর্ষের মতো দেশের সামনে তুলে ধরলো আশার আলোক বর্তিকা। এদেশের মানুষ নতুন আদলে উদ্বেলিত হলো, এদেশের পত্র-পত্রিকায় তার প্রতিফল ঘটলো।

পরাধীন ভারতবাসী তাদের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য বিশ্বের অগ্রগামী দেশগুলির দিকে বারে বারে তাকিয়েছে, এদেশের কবি সাহিত্যিক অন্য দেশের অগ্রগতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্য দেশীয় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের দৃষ্টান্ত তুলে এদেশীয় শ্রমজীবীদের প্রেরণা দেবার চেষ্টা করেছেন বাঙালী সাহিত্যিকঃ

"ওই দেখ সাগরের পারে,
শ্রমজীবী শত শত
কেমন সংগ্রামেরত
এই ব্রত—রবে না আঁধারে
আয় তোরা দেখি সবারে।"

[শিবনাথ শাস্ত্রী, 'ভারত শ্রমজীবী,' ১৮৭০]

এটা নভেম্বর বিপ্লবের অনেক আগের কথা।

নভেম্বর বিপ্লবের পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্র পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এ দেশের তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা বুঝেছিল যে, ১৯১৭-এর নভেম্বর বিপ্লব সর্বাত্মক বিপ্লব এবং তাদের পক্ষে 'বিপজ্জনক, ও বটে, তাই বিপ্লবের প্রকৃত বিবরণ তখন চেপে দেওয়ার চেষ্টা হয় এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার সুরু করে। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই 'দৈনিক বসুমতী, পত্রিকায় এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়ে যায়।

বিপ্লবী সংগ্রামে গরিব কৃষকের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী



কিন্তু নানা রকম বিধি নিষেধ এড়িয়ে, সংবাদ-পত্রগুলি যাদের করায়ত্ত সেই কায়েমী স্বার্থের বাধা ডিঙিয়ে এদেশে বিপ্লবের প্রকৃত বিবরণ প্রচারিত হতে তিন চার বছর সময় কেটে গিয়েছিল।

১৯২১ থেকেই প্রকৃত পক্ষে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব বঙ্গদেশে অনুভূত হতে থাকে। এই বছর 'সৎসঙ্গী, নামক একটি ধর্মীয় মাসিক পত্রিকায় 'লেনিন, নামক একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এতে লেনিন সম্পর্কে কুৎসার জবাব দেওয়া হয়েছিল এই ভাবে—"রুশের জনসাধারণ কেবল ভাবের ঘোরে অন্ধভাবে এই প্রলয় ব্যাপারে মেতে ওঠেনি, কিন্তু সজ্ঞানে একটা নতুন সৃষ্টির স্পষ্ট আদর্শকে সামনে রেখেই তারা এই ভাঙনের মাতনে মেতেছে।,,

['সৎসঙ্গী, বৈশাখ-ভাদ্র, ১৩২৮]।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সোভিয়েট বিপ্লবের সমর্থনে বিপ্লবের মূল কথাটাকেই তুলে ধরা হয়েছে। অনেকে বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে এক করে ধরেন; তাঁরা ভুলে যান যে, বিদ্রোহে শুধু বিরোধিতা থাকলে ও 'বিপ্লব,- এ থাকে প্রতিশ্রুতি—শুধু ভাঙ্গা নয়, ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার লক্ষ্য। 'সৎসঙ্গী, পত্রিকায় সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।

১৯২১-এই ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা যখন সুরু হয়, তার পর থেকেই কমিউনিস্ট মতবাদের তত্ত্ব ও ভাবধারা প্রচারের জন্যে মুখপত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মুখপত্র প্রকাশিত হয় ইংরেজী ভাষায় ১৯২২-এ, এর নাম The Vanguard of the Indian Independence. এটা ছাপা হতো বার্লিন শহরে অর্থাৎ ভারতের বাইরে। ঐ বছরেই ভারতে এস, এ ডাঙ্গের সম্পাদনায় উর্দু মাসিক 'ইনকিলাব' প্রকাশিত হয়।

ঐ একই সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম বের করেন তাঁর 'ধূমকেতু' গথ অর্ধ সাপ্তাহিক কাগজ। এই ধূমকেতু কমিউনিস্ট পত্রিকা নয়। মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন যে, কার্যত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতিই এর বেশী আবেদন ছিল। তিনি 'দ্বৈপায়ণ' এই ছদ্মনামে 'ধূমকেতু-তে লিখতেন এবং তাঁর লেখায় আবেদন ছিল গণআন্দোলনের দিকে। এই ধূমকেতুর লেখার জন্যই নজরুল রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং তাঁর কারাদণ্ড হয়।

নজরুল নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারা বিশেষ

গ্রাম-এলাকায় খাদ্য-সরবরাহকারী কর্মীদল। ১৯১৮



ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর "প্রলয়োল্লাস" কবিতায় রুশ বিপ্লবের জয়গান করে তিনি লেখেন:

"তোরা সব জয় ধ্বনি কর
তোরা সব জয় ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
—কালবো শেখীর ঝড়।,'

১৯১৯-এ লেখা নজরুলের ব্যথার দান গল্পটিও নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত। তা ছাড়া তাঁর সাম্যবাদের গান আর রুশ আন্তর্জাতিক সঙ্গীত রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি।

'ধূমকেতু, ছাড়া যে সমস্ত বাংলা পত্র পত্রিকা সে যুগে বিপ্লবের অনুকূলে সাড়া দিয়েছিল তাদের মধ্যে রয়েছে 'দৈনিক বসুমতী, 'আনন্দবাজার পত্রিকা, 'বাঙ্গলার কথা, 'দৈনিক বঙ্গবাণী, 'আত্মশক্তি, 'তত্ত্ববোধিনী,, লাঙ্গল (পরে গণবাণী), 'দেশ, 'নবশক্তি, পরিচয়, 'প্রবাসী, 'প্রাচী, 'মাসিক বসুমতী, 'মলিনী ও মর্মবানী, 'বর্তমান জগৎ, 'অরনি, নোয়াখালির দেশের বানী ঢাকায় 'বাঙ্গলার বানী, বিজলী, বৈঠক, ভারতবর্ষ, 'যুগান্তর ('শারদীয়া) 'শঙ্খ, 'শ্রমিক, ঢাকার 'সোনার বাংলা, সংহতি প্রভৃতি।

ওপরের তালিকা থেকেই প্রমানিত হয় যে, যে সমস্ত পত্র পত্রিকা নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সেগুলি সব কমিউনিস্টদের পরিচালিত পত্রিকা নয়। অবশ্য এই সব পত্র পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন যাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং এঁদেরই ব্যক্তিগত প্রভাবে ঐ সব পত্র-পত্রিকা নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি ছিলেন 'আনন্দবাজার পত্রিকার, সম্পাদক, ক্ষুরধার লেখনীর সাহায্যে তিনি যেমন একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনশক্তির বিরুদ্ধে জনমানসে তীব্র ঘৃনার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি দেশের যুবশক্তিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। তিনি স্তালিনের জীবনী রচনা করেন। 'অরনি, সাপ্তাহিক পত্রিকাটিরও তিনি সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকাটিও সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে জনপ্রিয় করে তোলে।

'লাঙল' বা 'গণবাণী' দুটী পত্রিকাই কমিউনিস্টরা পরিচালনা করতেন, যদিও এগুলি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ছিল না। কারণ সে যুগে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র রূপে কোনও সংবাদপত্র, প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। লাঙলের পরিচালক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের এবং সম্পাদক হিসেবে ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম থাকতো। নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতা বুকে নিয়েই 'লাঙল' প্রকাশিত হয় ১৯২৬-এর ৭ জানুয়ারী। তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় নজরুলের 'সব্যশাচী' কবিতা।

লাঙলে কৃষকদের দাবী কৃষি সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি নিয়ে প্রবন্ধ থাকতো। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' এই লাঙলেই প্রথম ছাপা হয়েছিল। "লাঙল' ও 'গণবানী-র সম্পাদক হিসেবে প্রথম দিকে অপরের নাম ছাপা হলেও পরে মুজফ্‌ফর আহমেদের নামই সম্পাদক হিসেহে ছাপা হতো।

এরপর কমিউনিস্টদের পরিচালনায় 'চাষী মজুর,' (১৯৩১) 'মার্ক্সবাদী' (১৯৩৩) এবং মাসিক গণশক্তি (১৯৩৪), প্রকাশিত হয়। গণশক্তির মুদ্রক ও প্রকাশক এবং সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মনোরঞ্জন রায় এবং সরোজ মুখার্জী।

কমিউনিস্ট পার্টির বাইরেও অনেকেই সে যুগে নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ যে জয়যুক্ত হবেই —এ সম্পর্কে অনেকেই স্থির বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। তাই দেখা যায় 'নব ভারত' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩৩০ বাংলা) লেখা হচ্ছেঃ "বলসেভিজম্ শাসক সম্প্রদায়ের কাছে হইয়াছে ঘরপোড়া সিঁদুরে মেঘ। সিঁদুরে মেঘ যেমন ঘরপোড়া গরুর প্রতি দয়া পরবশ হইয়া আকাশে ওঠা বন্ধ করে না, ঠিক তেমনি ভাবেই বলশেভিজমের মূলনীতি এবং আদর্শের প্রচার কেই বন্ধ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহার প্রচার বন্ধ করার জন্য লোকের দরকার হইবে না, দিনের আলো এবং আকাশের বাতাসের মতো সে আপনা আপতি পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে।'

'সাম্যবাদী, (মাস ১৩২৯ বাংলা) পত্রিকায় লেখা হলো ঃ "আজ পাশ্চাত্য খণ্ডে সাম্যবাদের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। ছোট যারা গাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে।,

শুধু পত্র-পত্রিকা নয়, কবি সাহিত্যিকদের বিভিন্ন রচনায় নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের কথা দেখতে পাওয়া যাবে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য বিশেষ ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাঁর নানা রচনায় এর ছাপ আছে। এ ছাড়া তাঁর রশিয়রে চিঠিতে রয়েছে তাঁর সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণের (১৯৩০-এ) অনবদ্য অভিজ্ঞতা। কবি রশিয়া ভ্রমণকে তীর্থ পর্যটন বলে অভিহিত করেছেন এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় চিন্ময়কর তুলনা রহিত অগ্রগতির কথা অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—"চিত্ত এবং কর্ম-পক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবরে-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে, সোভিয়েট রাশিয়া।

সে যুগের বিখ্যাত উপন্যাসিক মনীন্দ্রলাল বসুর 'অরুন' নামক গল্পে রয়েছে নভেম্বর বিপ্লবের কথা। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্পের নায়ক নভেম্বর বিপ্লবে যোগদান করে এবং ট্রেঞ্চ যুদ্ধে নিহত হয়।

নভেম্বর বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৪৩-এ সেদিনের চটকলের তরুণ শ্রমিক মনোরঞ্জন হাজরা লিখেছিলেন 'পলিগাটির ফসল' এবং 'নোঙরহীন নৌকা'। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কবিতায় ঘোষণা করেছিলেন ঃ

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের
আমি কবি যত ইতরের
আমি কবি ভাই কর্মের আর ধর্মের
বিলাস-বিকশ মর্মের মত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নাই।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, স্বর্নকমল ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার প্রমুখের লেখায় নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাস স্পটে ধরা পড়েছে। বর্ষীয়ান সুরেন ঠাকুরের 'বিশ্ব মানবের লক্ষীলাভ'-এ নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব সুস্পষ্ট।

'আত্মশক্তি' নামে যে পত্রিকাটি ছিল তার পৃষ্ঠায় যাদের লেখনী নভেম্বর বিপ্লবের সমর্থনে চালিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে রয়েছেন— উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, শচীন সেনগুপ্ত, গোপাল সান্যাল।

বাংলী লেখক, শিল্পীরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় থেকে, একক ভাবে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থেকে এই বঙ্গদেশে রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রবর্তিজ 'নতুন সভ্যতার, আদর্শ যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি যে সব অশুভ শক্তি সেই সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত তাদের প্রতিরোধের ও আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের এই বিশ্বাস ছিল যে পরাধীন জাতিকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখিয়েছে নভেম্বর বিপ্লব।



নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে সংস্কৃতির প্রশ্ন

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মহান নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের নবান্ন উৎসব। এই ঘটনা ১৯১৭ সালে রুশ দেশকেই শুধু পুরোন সামন্তবাদী পুঁজিবাদী শোষণের শৃংখল থেকে মুক্ত করেনি, তা সমগ্র বিশ্ব প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা মার্কসবাদী বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টি-কোণে মানুষের সমাজবিকাশের ধারাকে শুধু ব্যাখ্যাই করেনি, বুর্জোয়াদের শোষণযন্ত্রকে উচ্ছেদ করে নতুন সমাজতান্ত্রিক মানবতার বস্তুগত ও ভাবগত বৈপ্লবিক কর্মসূচিগুলি এগিয়ে নিয়ে গেছে। ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক চরিত্রের বিচারে এই মহান বিপ্লব মতাদর্শগত বিপ্লবও বটে। আজ বিশ্ব-সংস্কৃতির সংকট ও সমাধানের প্রশ্নগুলির আলোচনা একমাত্র এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণেই সম্ভব। বলা বাহুল্য, বিশ্ব-পরিস্থিতির এই বাস্তবতা থেকে আমাদের দেশের সংস্কৃতির সমস্যাগুলি আজ বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, যদিও আমাদের যুগসঞ্চিত মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতা ও কু-সংস্কারের জট কার্য-কারণ সম্পর্কে এরই মধ্যে সক্রিয়।

মানব পরিবেশের প্রাকৃতিক ও ব্যবহারিক সম্পত্তি তখনই পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে যখন তা বাজারে বিক্রি হয়ে মুনাফা অর্জনে চলাচল করেছে। এটা ঐতিহাসিকভাবে শুরু হয়েছে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের স্তরে, যার আদর্শগত বৈপ্লবিক উজ্জীবন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে বিশ্বসভ্যতার গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছে ১৭৮৯-৯১ সালের ফরাসী বিপ্লবে। লক্ষ্যণীয় যে, 'স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী'র বাণী নিয়ে ধনতন্ত্রবাদী বুর্জোয়ারা তখন থেকে সামন্তবাদী অভিজাতদের শোষণ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নতুন ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক মুনাফাকামী শোষণ ও নৈতিকতার বাস্তব ও ভাবগত পরিবেশ সৃষ্টি করে গোটা সমাজকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে—পুঁজিবাদী ও প্রলেতারিয়েত।

স্বভাবতই সমাজে যে-শ্রেণীর শাসন চলে তারই ভাবাদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আধিপত্য করে, ন্যায়-অন্যায়ের ভারসাম্য সেই মাপেই বজায় থাকে। এই পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমের সঙ্গে শ্রমিকও পণ্যে পরিণত হয়েছে, শিক্ষা-সংস্কৃতিও কেনাবেচার সামগ্রী হয়েছে। এরই মধ্যে কিছু নিচুর তলার লোক কথামালার ধূর্ত শেয়ালের মত বাঘকে জব্দ করে মজা পেয়েছে, অসাম্য-প্রতারণার এই বুর্জোয়া নৈতিকতার বেশ কিছু দার্শনিক-বুদ্ধিজীবী 'শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি মর্যাদাবোধ,' 'চুরি করা পাপ,' 'সামাজিক নিরাপত্তা', 'মহানুভবতা ও বদান্যতা নীতিবোধ' ধরনের কায়েমী স্বার্থের অনুকূল মতাদর্শ প্রচার করে সমাজে মান্যগণ্য হয়েছে। এই সমাজেই গণিকাবৃত্তি চালু রেখেই মানবতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার জয়গান চলেছে, দাস-প্রথা আইন করে বন্ধ করেও শিশু ও গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের কারখানা, খনি ও চা-বাগানের ঘানিতে ফেলে ফেলে প্রায় দিবারাত্র রক্ত শুষে 'জাতীয়' উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে, বিশ্বের বাজারে 'সাহায্য' প্রতিযোগিতায় বৃহৎ মাল্টি-ন্যাশানাল বুর্জোয়রা এক-একটা 'অরণ্যদেব'-এর মত অপরাজেয় হতে চাইছে। এদেরই বগলসে বাঁধা পড়ে বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ্-শিল্পী সাহিত্যিকদের বড় অংশই



এপ্রিল বিক্ষোভের সময় পেট্রোগাদ বাহিনী

ধ্বংসাত্মক নরমেধ যজ্ঞের ইন্ধন যুগিয়ে সুখশয্যায় এমনকি 'নোবেল প্রাইজ' আসন্ন বলে স্বপ্নও দেখছে।

আমাদের দেশে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা যে নতুন ব্যবস্থা চালু করেছিল তা তাদের উন্মেষ যুগের বিপ্লবী ভাবাদর্শে ভরিত হয়নি, তা ছিল পচনশীল মিল-বেন্থাম-বার্কের পাশ্চাত্য দর্শন-এর সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মিশ্র বাস্তব অবস্থা। এরই মধ্যে রেল-টেলিগ্রাফও বসেছে, স্বনির্ভর গ্রাম-সমাজের কুটির শিল্প ও ছোট ছোট পারিবারিক ভিটে থেকে ক্রমে বড় বড় শিল্প কারখানাও গড়েছে। স্বভাবতই রুশ দেশের নারোদবাদীদের মত একদিকে দেখা গেল পুরোন বন্ধনগুলি ছিন্ন হবার মায়াকান্না, নতুন শ্রেণী-সমাবেশ ও তার সংগ্রামী আবর্তের বাস্তবতাকে অস্বীকার, মহামানবের আবির্ভাব কল্পনা। ইতিহাসের পিছুটান, পেটি-বুর্জোয়া পুঁথোবাদের 'ভবিষ্যৎ অন্ধকার'-এর বিষণ্ণ করুণ ভাবাবেগের আচ্ছন্নতা; অপরদিকে সাগর পার থেকে আসা পাশ্চাত্যেরই বেকনীয় এনলাইট-নারদের প্রভাবে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-ডিরোজিও প্রমুখ কয়েকজন মনীষী স্রষ্টার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় কু-আচার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটল, মধুসূদনের চিত্রাঙ্গদা বলল—'পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি নহি/অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি,' রবীন্দ্রনাথের ('স্ত্রীর পত্র'-এর) মৃণাল ইবসেনের নোরার মত আধিপত্যকামী স্বামীর ঘর ছেড়ে গেল, শ্রমিকরা ধর্মঘট করল, নীল-সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহ্যে বলীয়ান কৃষকরা সেই ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজ নিয়ে (শহরে এসে) বাঁচার হাতছানি প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করল। অর্থাৎ আমাদের সমাজের মধ্যে এই দোলাচলতা ও সীমাবদ্ধতার উপাদান ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কৃষকের অবস্থা'র মত প্রবন্ধ লিখেও 'কৃষ্ণচরিত্র' বা 'ধর্মতত্ত্ব' প্রচার করেন, রোহিনীর ঐ করুণ পরিণামকে নীতিবোধের গৌরবে সৌন্দর্যায়িত করেন, আবার শরৎচন্দ্র রোহিনীর প্রতি দরদী হয়েও, অভয়া-সুনন্দার মত বিদ্রোহী চরিত্র সৃষ্টি করেও প্রচলিত হিন্দু-সংস্কার ও 'সামাজিক মূল্যবোধ'কে আঘাত করে সৌন্দর্য-সৃষ্টি ব্যাহত হবার আশঙ্কায় বিধবা বিবাহ দিয়ে সুস্থ বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা দিতে পারলেন না।

এই শরৎচন্দ্রই 'একাদশী বৈরাগী' গল্পে অপূর্ব নামে এক অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কালীদহ গ্রামের ধনীর ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানটি কলকাতা থেকে 'অনার সহ গ্রাজুয়েট' হয়েও, সমকালের শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য-পন্থীদের বিতর্কে শ্রেণীগত কারণেই গ্রামে ফিরে বর্ণাশ্রমভিত্তিক হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। 'পণ্ডিত মশাই'-এর কেশব শহর থেকে ইংরেজি-জানা বাবু হয়ে গ্রামে ফিরে স্কুল করে। গরিব চাষি-তাঁতিদের ছেলেরা সেখানে যায় না। কিন্তু গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান বৃন্দাবনের পাঠশালায় ছাত্র উপচে পড়ে। 'পল্লীসমাজ'-এর বেণী ঘোষাল রমাকে বলছে—"এই যে একটা নতুন ইস্কুল করেছে, এই নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। এমনিতেই ছোটলোকগুলো জমিদার বলে মানতে চায় না।

এই ঘটনাগুলি থেকে কি কি বেরিয়ে এল ?

এক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা উৎপাদন, জীবন ও কর্মবিমুখ হওয়ার কারণে মধ্যযুগীয় অন্ধতা এ প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব গ'ড়ে চেতনার কোন পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেনি।

দুই. জমির মধ্যস্বত্তীয় শ্রেণীস্বার্থ এবং মনু-পরাশরের শাস্ত্রাগত উত্তরাধিকার সঙ্গতিপূর্ণ উপরিস্থাক বা নিরাপত্তার সাংস্কৃতিক প্রহরী।

তিন. ইংরেজি-জানা বাবুরাও যেমন গরিব মুনিশ-কারিগরদের 'ছোটলোক'ও ভাবে, আবার তাদের প্রতি কিছু করুণা দেখিয়ে মহানুভবও সাজে। কৃষিপ্রধান দেশের ৭৫ শতাংশ ঐ নিরক্ষর মানুষও ঐ ধরনের 'বাবু'-দের থেকে শত হস্ত দূরেই থাকে। পাছে বাবুদের মত পড়ালেখা শিখে ঘরের ছেলেরা কর্মবিমুখ হয়ে যায় তাই তাদের ডাকে যায় না। আবার জমির ক্ষুধার মত জানার তৃষ্ণাও প্রবল তাই 'আপনজন'দের কাছে পড়া লেখা ও গণিত শিখতে যায়।

চার. চাষিদের ঠকিয়ে সম্পদ বাড়ানোয় বাধা হবে না। অজ্ঞতাই দোহনের উপযুক্ত জমি।

পাঁচ. কিষাণের জীবনের শরিক যে-জন' (রবীন্দ্রনাথ) তারাই পারে যুগসঞ্চিত প্রাচ্য-স্বৈরাচারের ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতা, বিষাদ ও হীনমন্যতার পাথর সরিয়ে কোটি কোটি নিরক্ষরকে প্রদীপের কাছাকাছি আনতে। সরকারি আমলাতন্ত্র বা পেটি-বর্জোয়া আত্মাভিমানে বিচ্ছিন্ন চাকুরে মধ্যবিত্তদের দিয়ে গণশিক্ষার কাজ হওয়া কঠিন; এর জন্য প্রয়োজন কৃষকদের নিজস্ব সংগ্রামী সংগঠনের আহ্বান ও উদ্যোগ।

এ তো গেল গ্রামের কথা। এদেশের বুর্জোয়ারা কেবলই জাত-পাত, সাম্প্রদায়িক ভেদ, উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের 'নৈতিক ভাবধারা'র পরিচর্যা করেনি, বাবু কালচার ও কুলি-কালচারের সঙ্গে, গ্রাম ও শহরের সঙ্গে ফারাক বানিয়ে ভিক্টোরিয় ভারসাম্যের দ্বন্দ করে ছেড়েছে। সাহেবদের তোষামোদ অথবা প্রতারণা করে কিছু পয়সা কামিয়ে দেশি ভদ্রলোকেদের কিছু ইংরেজি বলা ও একাধিক রমণীসঙ্গ যেন আভিজাত্যের প্রতীক হয়েছে; হাটে-বাজারে, আদালতে-আপিসে মিথ্যা, শঠতা, ঘুষ ও জুয়াচুরিই বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবানদের গুণপনায় পরিণত হয়েছে। এ সবই পচনশীল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শের যোগসাজসে গড়া সমাজের 'ওয়েজ অব লাইফ' বা সংস্কৃতি।

আজ এই নয়া-উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ইয়াঙ্কি কালচারের স্তরে ঐ ভিক্টোরিয় নৈতিকতাও অচল। এর লক্ষণগুলি হল ঃ অবাধ বাজারের বেশ্যাপনা, খুন, ড্রাগ হ্যাবিট, নারীধর্ষণ, আত্মহনন, রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ, সুপারম্যান, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য ও সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলিকে গৌরবান্বিত করা, ব্যাপক প্রচার মাধ্যমে ম্যাস্-কালচার-এ পরিণত করা, সাঁইবাবা-জ্যোতিষী সুপারম্যান-এর কাছে বিজ্ঞানের ব্যর্থতা দেখানো ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের চালাও কারবার। লক্ষ্যণীয় যে, এইসব অবক্ষয়ী প্রবণতার রাহুগ্রাসে যুবসমাজের সঙ্গে শিশুরাও বাদ পড়ছে না। প্রশ্নটা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মনে অন্ধকারের হতোশ-লাগা নয়, বেশি মারাত্মক বুর্জোয়া নৈতিকতার অর্থলোভ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থান্ধতা শ্রমিকশ্রেণীর বড় অংশকেও কলুষিত করছে, এখনো অর্থনীতিবাদী ঝোঁক ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে থাকায় তাদের অনেককেই পেটি বুর্জোয়া অহমিকা ও রক্ষণশীলতার জাল থেকে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছে না। অর্থনৈতিক অবস্থানে যারা নিঃস্ব, শোষিত ও প্রবঞ্চিত তাঁরা অনেকেই গ্রামে জমি থাকলে বর্গায় বা জমিতে কাজের নিরাপত্তা স্থাপনে, জনশিক্ষার কর্মসূচিকে বাধা দিচ্ছে, ও জাত-পাতের নিগ্রহে মদত দিচ্ছে।

অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফাঁক দিয়ে বুর্জোয়া জমিদারদের রাষ্ট্রযন্ত্র শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তদের এইভাবে কলুষিত করছে, অর্জিত মূল্যবোধগুলিকে পর্যন্ত মুছে। নিজেরাও যেমন দ্রুত নেমে যাচ্ছে, জনগণকে তেমনি আরও বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত করতে সব রকম চেষ্টা চালিয়ে নিজেদের 'সাংস্কৃতিক' পাহারা মজবুত করছে। আজ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সংগ্রাম এই কারণেই আমাদের জাতীয় প্রশ্ন। একদিকে সামন্তবাদী অবশেষের রক্ষণশীল প্রভাব, অপরদিকে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের অবক্ষয়ী ভাবধারার প্রভাব

—এই দ্বিমুখী আক্রমণকে প্রতিহত করে গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটাতে না পারলে প্রলেতারিয় বিপ্লবী সংস্কৃতির জন্য সচেতনতার ভিত্তি রচিত হতে পারে না। এ কথা ঠিক, সমাজে যে সব বস্তুগত ও ভাবগত বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তাতে স্বভাবতই ঐ সব অবক্ষয়ী প্রবণতার প্রাধান্য থাকবে, আরও বাড়বে। অথ কিম্? অর্থাৎ সমাজের অর্থব্যবস্থার বা উৎপাদন সম্পর্কের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রতিফলনই যদি সংস্কৃতি হয়, তবে এই রকম সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামে ফয়দা কিসের? সমাজটা বদলালেই তো নতুন সংস্কৃতি ও তার মূল্যবোধের জন্ম ও বিকাশ হবে।

এইখানেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার ঃ

এক. সংস্কৃতি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরিথাক হলেও ঠুঁটো জগনাথ বা নিষ্ক্রিয় ছায়া নয়।

দুই. সামাজিক ভিত্তি ও তার পেয়াদা পারিষদদের অবস্থান সব সময়ে সমান্তরাল ও দ্বন্দ্বহীন থাকে না। অর্থাৎ যুগে যুগে প্রতিটি সমাজে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই ইতি-নেতির, পীড়ন-প্রতিবাদের ও স্থিতি-গতির পারস্পরিক সংঘাত প্রক্রিয়া চলেছে বলেই মানবসভ্যতার বিকাশ হয়েছে—বর্বর বা আদিম সাম্যবাদী যুগ থেকে সভ্যতার যুগে, দাস যুগে, সমান্ত যগে, ধনতন্ত্রের যুগে ও সমাজতন্ত্রের যুগে।

তিন. সংস্কৃতি কেবলই কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নৃত্যগীত বা নাট্য, চিত্র ও ভাস্কর্য ইত্যাদি হৃদয়গত উন্মেষ নয়, এর সঙ্গে শ্রম, বুদ্ধি ও দক্ষতা সমগ্র সৃষ্টিকর্মই যুক্ত।

চার. শিক্ষা আনে চেতনা, যা বিপ্লবী পরিবর্তনের পূর্বশর্ত। অর্থাৎ শিক্ষাই হল সংস্কৃতি, যার প্রক্রিয়া বর্বর যুগেও ছিল (মাটির পাত্র, গুহাচিত্র, পাথরের হাতিয়ার)। আসলে শ্রম ও শিক্ষার যৌথ ভূমিকার বিকাশ ঘটিয়ে মানুষ শুধু সভ্যতার যুগে আসেনি, তার ক্রমবিকাশে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস স্টার্কেনবুর্গকে লেখা এক চিঠিতে ব্যাখ্যা করে বলছেন—"রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদির বিকাশধারা অর্থনৈতিক বিকাশের উপরই নির্ভরশীল, কিন্তু এরা পরস্পরের উপর, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরও প্রভাব বিস্তার করে। এ কথা আদৌ ঠিক নয় যে অর্থনৈতিক অবস্থানই একমাত্র কারণ এবং একাই সক্রিয়, বরং বলা চলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে ভিত্তি করে নানামুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে, আর অর্থনৈতিক প্রয়োজনই শেষপর্যন্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

সমাজের বিকাশে প্রয়োজনীয় কাজের তাগিদটাই বড় কথা। এই থেকেই মানুষ নতুন ধারণা পদ্ধতি ও মতবাদ গ'ড়ে তোলে, যা দিয়ে পুরোন ও প্রচলিত বাধা দূর করে এগিয়ে যায়, জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত ক'রে ক্ষয়িষ্ণু প্রথা ও ভাবাধারাগুলিকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরাস্ত করে।

পাঁচ. শিল্প-সংস্কৃতি মানুষকে তৃপ্তি দেয়, আনন্দ দেয়. এগুলি ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার, সবার জন্য নয় ইত্যাদি কথা চালু হয়েছে বুর্জোয়ারা সমাজে কায়েম হবার পর থেকেই। অর্থাৎ যে বুর্জোয়ারা সামন্তযুগের বেশ কিছু আধার রেখেই বক্তব্যে ও ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলো বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে, সেই তারাই আইন, ধর্মদর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অঙ্গসজ্জা ও মর্মবস্তুকে এমনভাবে গড়ে নিল যাতে তার নিজস্ব অর্থব্যবস্থারই প্রহরিগিরি মজবুত হয়।

এই সঙ্গে এটাও ঠিক, বুর্জোয়ারা উৎপাদনের পদ্ধতি ও উপকরণের অবিরাম পরিবর্তন না ঘটিয়ে বাঁচতে পারে না। এরই কারণে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সংকট-সংঘাতের আবর্তে পড়ে অবিরাম সংস্কৃতির পোশাক-পরিচ্ছদ ও কলাকৌশল বদলে নেয় আত্মরক্ষারই প্রয়োজনে। সার্ভেন্তিস-সেক্সপীয়ার-ইবসেন থেকে আয়ানেস্কো বেকেট-জয়েসে এবং বেকন থেকে বার্কলে-ব্যালেন্টাইনে আসতে হয় এই কারণেই। এটাই বুর্জোয়াদের ট্রাজেডি। কার্ল মার্কস তাঁর 'এইটিনথ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্টিতে অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় বলছেন—"অতীতের সমস্ত মৃত মুখগুলির ঐতিহ্য জীবিতদের মস্তিষ্কে রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত চেপে থাকে। এবং তখনই তারা নিজেদের সঙ্গে অন্য সবকিছুকেই বৈপ্লবিক প্রবাহের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করে অভূতপূর্ব কিছু সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং সেই সংকটের মুহূর্তেই তারা বাস্তবতার সঙ্গে অতীতের সমস্ত চরিত্র বা উপাদানগুলিকে যেন মন্ত্রবলে নিজেদের সেবায় নিযুক্ত করে—তাদের নাম, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রণধ্বনিগুলিকেও অনুকরণ করার চেষ্টা করে...উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব মৃতকে অবশ্যই সমধিস্থ করবে। আগে যেখানে বক্তব্য অধারকে অতিক্রম করেছিল, আজ সেখানে আধার বক্তব্যকে ছাপিয়ে যাবে।"

এই স্তর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবক্ষয়ী স্তর—সাম্রাজ্যবাদ, যে-স্তরে বিশ্ব-বাজারের দখল কায়েম করতে পারমানবিক যুদ্ধের প্রয়োজনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিপুল ও গভীরতর বিকাশ অনিবার্য হয়েছে, যার দাবিতে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বিকাশও ঘটাতে বাধ্য হয়েছে। যে পুঁজিবাদী সভ্যতার বুকের উপর দাঁড়িয়ে একদিন দিদেরো-টলস্টয় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা বলেছিলেন—শ্রমজীবীদের অজ্ঞতাই শাসকদের শোষণ ও প্রতারণার মূল শক্তি, সেই পুঁজিবাদের চূড়ান্ত স্তরে—সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ক্ষুধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন দৃপ্ত বিশ্বাসে ঘোষণা করেছেন—তোমাদেরই আধার তোমাদের বক্তব্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সেই পরিবর্তিত আধার থেকে জেগে উঠেছে নতুন শক্তি নতুন বক্তব্য যা আবার নতুন আধারের জন্ম দেবেই। রুশ শিক্ষাবিদ কালিনিন বুর্জোয়া শিক্ষা-সংস্কৃতি এই দ্বন্দ্বটিকে ব্যাখ্যা করে বলছেন—"বুর্জোয়ারা চায় শ্রমিক কৃষক কোন প্রতিবাদ না করে দাসানুদাস হয়ে শোষণের সব বোঝা বহন করুক। তাই গোড়া থেকেই তাদের মধ্যে কোন উদ্যম ও সাহস সঞ্চারক সংস্কৃতি প্রচার থেকে বিরত থেকেছে, সেই রকম শিক্ষা থেকে দূরেই রেখেছে। কারণ অজ্ঞান ও দুর্দশাগ্রস্ত লোককে বাগে রাখা সহজ কিন্তু এই ধরনের লোক দিয়ে তো যুদ্ধ জয় হয় না। প্রাথমিক কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি না দিলে তো তাদের যন্ত্র ও অস্ত্র চালানোয় উৎসাহিত করা যাবে না। একদিকে যন্ত্রপাতির উন্নতি, যুদ্ধাস্ত্র প্রতিযোগিতা, অপরদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতির সুযোগলাভের জন্য শ্রমিক-কৃষকদের অধিকারের সংগ্রাম বুর্জোয়াশ্রেণীকে বাধ্য করে তাদের কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি দেবার ব্যবস্থা করতে। পাশাপাশি আগ্রাসী যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও সাহস ও অন্যান্য গুণের বিকাশ ঘটাতেও তারা বাধ্য হয়, যা শেষপর্যন্ত বুর্জোয়াদের পক্ষেই বিপজ্জনক।"

এই 'বিপজ্জনক' ঐতিহাসিক ঘটনাই ১৯১৭ সালের রুশীয় নভেম্বর বিপ্লব। পচনশীল বর্বর বুর্জোয়াদের পক্ষে যা বিপজ্জনক, বিশ্বের শ্রমজীবী, বিবেকী ও গণতান্ত্রিক জনগণের পক্ষে তা আশীর্বাদ।

একদিকের বিপদ ও অন্যদিকের এই আশীর্বাদ অনিবার্য হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব থেকে; আর যেখানেই দ্বন্দ্ব বা সংকট সেখানেই তা থেকে উত্তরণের শক্তি অনুভূতি ও সচেতনতার স্তর থেকে ক্রমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই থেকে বিপ্লবী মানসিকতার জন্ম ও বিপুল সমাবেশ হয়।

যে বুর্জোয়া উন্মেষ যুগের সংস্কৃতি ভাবনায় প্রদীপ্ত মধুসূদন তাঁর চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দৃপ্ত উচ্চারণ শুনিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে এসে বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের পচনশীলতার নর্দমা থেকে জার্মান ফ্যাসিবাদের দার্শনিক স্পেংলার নারী সম্পর্কে শোনালেন—'নারীরা সাথীও হবে না, প্রিয়াও হবে না, হবে শুধু যোদ্ধা-সন্তানের গর্ভধারিণী।' কিন্তু আমরা এরই মধ্যে গোর্কির 'মা' পেয়েছি, নভেম্বর বিপ্লবের মহান নেতা লেনিন যে-সৃষ্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর উপর প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ব্যবস্থা ও ভাবধারার বিরুদ্ধে বিপ্লবী আয়ুধ বলে বর্ণনা করেছেন।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী প্রক্রিয়ায় এই ঘটনা আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ছিল না। বিপ্লবের এই পর্বে কোন শক্তি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র (বিশ্বযুদ্ধ ও সামরিক ষড় যন্ত্রের হাতিয়ার) এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাবের বাইরে থাকতে পারে না। এই পর্বের দ্বন্দ্বগুলিই শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লব সংঘর্ষের পথে নিয়ে গিয়ে, পুরোন রাষ্ট্রের কেন্দ্র দখল করেই নয়, তাকে সমূলে উচ্ছেদ ক'রে, অর্থাৎ জমিদার-ধনীক শ্রেণীর হাত থেকে উৎপাদনের উপায় ও হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে সেগুলিকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার দিকে নিয়ে গেছে। এইভাবেই নভেম্বর বিপ্লব সারা বিশ্বে একই সঙ্গে নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি ও সূচনা করল, যা বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব অথচ অনিবার্য ঐতিহাসিক সত্য।

তাহলে আজকের বিশ্বব্যবস্থার দ্বন্দ্বগুলি কি? বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক শক্তির, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের, ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির সঙ্গে শাসক-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বন্দ্ব। এগুলিরই মধ্যে সব জাতির সংগ্রামেই শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শগত বিপ্লবের প্রভাব তীব্রতর হয়েছে—চীন, কোরিয়া, কিউবা, ভিয়েতনাম ও আফ্রিকার নানা দেশের বস্তুগত ও ভাবগত পরিবেশে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এইসব দেশের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে ও বিকাশে আজ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের বা সংস্কৃতির প্রভাব যেমন সক্রিয়, তেমনি আমাদের মত বুর্জোয়া-জমিদার তন্ত্রের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেও এই বিপ্লবী সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিটি স্তরের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। বলা বাহুল্য, বনিয়াদের লড়াই আর উপরিথাক বা সংস্কৃতির লড়াই বিচ্ছিন্ন নয়। হয়ত কখনও কোন দেশে একটা অপরটার চেয়ে এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকে। কিন্তু পরস্পর পুষ্ট ও শক্তিশালী হয় তখনই যখন দুটি ধারাই সমান্তরাল থেকে একে অপরকে প্রভাবিত করতে করতে এগিয়ে যায়।

নভেম্বর বিপ্লবের সংস্কৃতি ও তার মূল্যবোধ থেকে আমরা এটাই শিখেছি—জনগণ ও বিপ্লবী এক নয়, শাসক শ্রেণীই বিপ্লবী সংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি, তার সংস্কৃতি নিছক লোক-সংস্কৃতি নয়—গণ-সংস্কৃতি যার মধ্যে অতীতের সমস্ত বিপ্লবী অধ্যায়ের, সমাজ বিকাশের ইতি-বাচক মানবিক উপাদানগুলির নব রূপায়ণ ঘটে, যৌথ শ্রম ও যৌথ সংস্কৃতির গণভিত্তি প্রসারিত হয়, একই সঙ্গে পিছুটানেরও প্রচলিত অবক্ষয়ের বাধাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধাত্মক মতাদর্শ ও কর্মসূচি এবং সৃজনাত্মক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকে, দ্রুত জনশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে এই নতুন সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল্যবোধে ও অধিকারে রূপান্তরিত করার কাজ চলতে থাকে—প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং পরোক্ষে আধা-ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী ও আমাদের মত 'স্বাধীন' বুর্জোয়া-জমিদারদের আধিপত্যের দেশে।

এই বিপ্লব আমাদের আরও শিখিয়েছে, সামন্ত ও বুর্জোয়া যুগের শাসকরা শ্রমজীবী মানুষকে যে বিপুল সাংস্কৃতিক অতীত থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন রেখেছিল সেই অতীত ঐতিহ্যকে পূর্ণ উদ্যমে ও স্বাধিকার বোধেই অর্জন করতে হবে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, অতীতের জঞ্জালগুলিকেও গ্রহণ করতে হবে। ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস তাঁর 'এ্যান্টি ডুরিং'-এ ঐ মহা পণ্ডিতটির 'অতীত মুছে ফেলার' ও 'সমস্ত ধর্মকে নিষিদ্ধ' করার অতি-বাম তত্ত্বকে জোর এক হাত নিয়েছেন। লেনিন ও মাও-কেও 'প্রলেতারিয় সংস্কৃতি আকাশ থেকে নেমে আসে না' বলে বারবার মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে হয়েছে।

আরও একটি প্রশ্ন: সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ী বুর্জোয়াদের আর দেবার কিছু নেই। তাদের অবক্ষয়ী নেতিবাচক প্রভাব তাদের নিজেদের দেশে, সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং আমাদের মত নয়া-ঔপনিবেশিক দেশে সদা-সক্রিয়। কিন্তু আমরাতো এ কথাও ভুলতে পারি না যে, আজ ঐ সব সাম্রাজ্যবাদী দেশের জনগণের উপর, আমাদের মত দেশগুলির উপর সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির মতাদর্শগত প্রভাবও একেবারে নিষ্ক্রিয় নয়, বরং তা দিনে দিনে বাড়ছে। ঐ সব পশ্চিমী দেশে, খোদ মার্কিন মুল্লুকে নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে, অর্থনীতির সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী ও বিবেকী মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে তা কি আঁরি বারবুস-এর 'লে ফু' অথবা চার্লি চ্যাপলিনের 'গ্রেট ডিক্টেটর' ও 'মডার্ন টাইমস্'-এর মহান উত্তরাধিকার নয়? তা কি আজ বিগত বিশ্বযুদ্ধ, নভেম্বর বিপ্লব ও ভিয়েতনামের বিপ্লবী যুদ্ধের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নয়?

স্মলনিতে লেনিন: শিল্পী সেরোভ্



শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব

মনোরঞ্জন রায়

আজ আর বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে নভেম্বর বিপ্লবের ঘটনা অজানা নয়। সবাই জানেন যে, নভেম্বর বিপ্লব সফল হয়েছে মহান লেনিনের পরিচালনায় রুশ দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে। তবুও আজ নভেম্বর বিপ্লবের ৬৫ বছর পরেও আমরা নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য, লেনিনের যে তত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শোষক শ্রেণীকে নির্মূল করে শ্রমিকশ্রেণী একনায়কত্ব কায়েম করে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ও দেশের অভ্যন্তরীণ তদানীন্তন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির মিলিত সশস্ত্র আক্রমণকে প্রতিহত করে বিপ্লবের বিজয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল সেই তত্ত্বগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করে।

একথাও আজ আর কারো কাছে অবিদিত নেই যে, মহান লেনিনই মার্কসবাদকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে তাকে আরো পরিণত করেছিলেন, আরো সমৃদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে পৃথিবীর দেশে দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টিগুলি নিজ নিজ দেশের বিশেষ অবস্থায় বাস্তবে প্রয়োগ করে পৃথিবীর দুই-পঞ্চমাংশে শোষণ হীন সমাজ কায়েম করেছে। আজও সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক, উন্নয়নশীল ও পরাধীন দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগ করেই নিজ নিজ দেশে স্বাধীনতা ও সমাজবাদ কায়েম করার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এটাও আজ সবাই জানেন যে, মার্কসবাদ বাস্তবে রূপায়িত করা তথা সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব প্রয়োগ করা, পরিস্থিতির নির্ভুল মূল্যায়ন করে সঠিক কৌশল প্রয়োগ করা, রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশের সুশৃংখল ও শক্তিশালী সংগঠন ও সংগঠনে সঠিক নীতি তথা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার স্বীকৃতি এবং সর্বোপরি সর্বহারার একনায়কত্বের অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করা ও তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন বলেই মহান লেনিন রুশ বিপ্লবকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ভারতবর্ষের শ্রমিক-আন্দোলনে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব কীভাবে এল এবং ভারতবর্ষের শ্রমিক-আন্দোলনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আমরা কীভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছি? বস্তুতঃ পক্ষে ১৯১৭ সালে যখন রুশ-বিপ্লব সংঘটিত হয় তখন ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের শৈশবাবস্থা। একথা ঠিক যে, ১৯০৮ সালে তিলকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ে ছয় দিনব্যাপী সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট পালিত হয়, যে ধর্মঘটে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এই ধর্মঘট প্রসঙ্গে কমরেড লেনিন বলেছিলেন, ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠছে। কিন্তু ১৯০৮ সালের পরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোন সুসংহত ও সংগঠিত শ্রমিক-আন্দোলন ছিল না। অমানুষিক শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ধর্মঘট সংঘটিত হতে থাকে। এই সময় জাতীয় আন্দোলনও অনেকটা অগ্রসর হয়। তার ফলে দুই একজন উদারনৈতিক নেতা শ্রমিকদের শোচনীয় দুরবস্থা লাঘবের উদ্দেশ্যে জনসেবার মনোভাব থেকে তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯১৭-১৮ সালে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের শেষভাগে নভেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং দেশে দেশে বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে শ্রমিকদের উপর শোষণের তীব্রতা বাড়ে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দ্বিগুণ হয়ে যায়, মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শ্রমিকদের বেতন বাড়ে না। সেই সময় ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী পরাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা দেশে ধর্মঘটের ঢেউ বয়ে যায়। ১৯১৮-২১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী বহু রাজনৈতিক সংগ্রাম ও অন্য শিল্পের শ্রমিক-সংগ্রামের সমর্থনে সংহতি-মূলক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনে নভেম্বর বিপ্লবের তত্ত্বগত প্রভাব পড়ে নি। এই সময়কার পরিস্থিতি ও শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমরেড রজনীপাম দত্ত তাঁর "আজিকার ভারত" পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে—

> "প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আলোড়নের ফলে ভারতের মজুর আন্দোলন যেন একলাফে পূর্ণ কর্ম-তৎপরতার ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছে। ভারতে শুরু হইল আধুনিক শ্রমিক আন্দোলন"।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে —

> "যে ধর্মঘটের ঢেউ ১৯১৮ সালে আরম্ভ হইয়া ১৯১৯-১৯২০ সালে সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িল তাহার প্রচণ্ডতা ছিল অপরিমেয়। ১৯১৮ সালের শেষভাগে বোম্বাই কাপড়ের কলগুলির ধর্মঘট একটা গোটা শিল্পের উপর ব্যাপক আঘাত হানে। ১৯১৯ সালের জানুয়ারীর মাসের মধ্যে সমস্ত মিলের

১

মোট প্রায় ২৫ হাজার মজুর-কল হতে সরিয়া দাঁড়ান। ১৯১৯ সালের বসন্ত কালে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে হরতালে যোগদানের জন্য মজুর-শ্রেণী বিপুলভাবে সাড়া দিয়া সকল শ্রেণীর সমস্ত জাতীয় সংগ্রামে শ্রমিকদের রাজনৈতিক ভূমিকারও প্রমাণ দেন। ১৯১৯ সাল ধরিয়া সারা দেশে ধর্মঘটের ঢেউ বহিয়া যায়। ১৯১৯ সালের শেষভাগে ও ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে ঐ-রকম বহু ধর্মঘট উঠিয়া পড়ে" ("আজিকার ভারত" নির্বাচিত অংশ পৃঃ ১১৩).

এই সমস্ত ধর্মঘট-সংগ্রামের মধ্য থেকেই প্রধান প্রধান শিল্প এবং বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ প্রভৃতি কেন্দ্রগুলিতে বহু সংখ্যক শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে বিভিন্ন, ধর্মঘট-সংগ্রামের মধ্য থেকে। সমাজ-তন্ত্রবাদ বা শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণার উপর ভিত্তি করে এই সংগঠনগুলি গড়ে ওঠেনি এবং এই সংগঠনগুলির নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদেরও শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। এদের অনেকেই জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণায় শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৯২০ সালেই প্রথম সর্ব-ভারতীয় ভাবে শ্রমিক সংগঠনগুলি, মিলিত হয়ে সারা ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ে তোলে। তার নেতৃত্বে থাকে সংস্কারবাদী বুর্জোয়া-নেতৃবৃন্দ। সভাপতি করা হয় জাতীয় আন্দোলনের নেতা লালা লাজ-পত রায়কে। প্রকৃতপক্ষে নভেম্বর বিপ্লবের তত্ত্বগত প্রভাব পড়তে থাকে তখনই যখন থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেমন, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ কানপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে, যারা কলকাতা বোম্বাইয়ের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করতে থাকে। বৃটিশ সরকার শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব উপলব্ধি করে তাকে অংকুরেই বিনাশ করার জন্য ১৯২৪ সালে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে "কানপুর ষড়যন্ত্র-মামলা"য় জড়িয়ে দেওয়া হয়। এই মামলায় কমরেড মুজফফর আহ্‌মদ, ডাঙ্গে, সওকতওসমানী সহ চার জনের ৪ বৎসরের কারাবাস আদেশ হয়। এই দমন-নীতি কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অগ্রগতিকে রোধ করতে পারে নি এবং তা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কমরেড রজনীপাম দত্ত আরও বলেন ঃ

> "সকল প্রকার বাধা ও প্রথমদিকের বিভ্রান্তি বা গোলমেলে ধারণা সত্ত্বেও যুদ্ধোত্তরকালে মজুরশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রসার লাভ করিতে থাকে —শ্রমিকরা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। ১৯২০ সাল হইতে তৎকালীন দুর্বল কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার সাহিত্য ক্রমেই জনপ্রিয় হইতে থাকে"। ("আজিকার ভারত নির্বাচিত অংশ" রজনী পাম দত্ত পঃ ১১৯)

এই সময় থেকেই শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। শ্রমিক আন্দোলনে এই নতুন চিন্তাধারার প্রভাব ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হতে থাকে। এই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতাও বাড়তে থাকে এবং তা আরও অনেক বেশি সংগঠিত রূপ নেয়। ১৯২১ ও ১৯২৮ সালের, ধর্মঘটগুলির তুলনামূলক বিচার করলেই তা বোঝা যাবে। ১৯২১ সালে ধর্মঘট বা লক-আউটের সংখ্যা ছিল ৩৯৬টি। ঐসব ধর্মঘট বা লক-আউটে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬,০০,৩৫১। সেই তুলনায় ১৯২৮ সালে মোট ২০৩টি ধর্মঘট বা লক-আউটে জড়িত শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫,০৬,৮৫১ জন। কিন্তু ১৯২১ সালে যেখানে মোট কাজের ঘন্টা নষ্ট হয়েছিল ৬৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ঘন্টা, সেখানে ১৯২৮ সালে নষ্ট হয়েছে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ঘন্টা। অর্থাৎ ১৯২১ সালের তুলনায় ১৯২৮ সালে ধর্মঘট বা লক-আউট ছিল অনেক দীর্ঘ-স্থায়ী। এই সময়কার ধর্মঘট সংগ্রামের তীব্রতা ও শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী মতবাদের প্রসার উল্লেখ করে কমরেড রজনীপাম দত্ত বলেছেন ঃ—

১৯২৮ সালে প্রচণ্ড মজুর



আন্দোলন দেখা যায়। যুদ্ধোত্তরকালে ইতিপূর্বে এরূপ প্রবল আন্দোলন আর লক্ষিত হয় নাই। বোম্বাই এই অগ্রগতির কেন্দ্র। এই সর্বপ্রথম কলকারখানার মজুরদের সহিত নিবিড় সংযোগ, সজ্ঞম ও শ্রেণী সংগ্রামের মূলনীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত এক নতুন শ্রমিক নেতৃত্ব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক অখণ্ড শক্তি হিস্যাবে কাজ করিতে থাকে। শ্রমিকদের নিকট হইতে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। ফেব্রুয়ারি মাসে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়া মজুরশ্রেণী জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী নেতৃত্ব শংকিত হইলেন।" (ঐ পৃঃ ১২০।)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর এক, গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী সাধারণভাবে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ১৯৪৫-৪৬ সালে নৌ বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী এক বিরাট গণ-অভ্যুত্থান হয়। নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী সাধারণ ধর্মঘট করে এগিয়ে আসে। জনগণের বিপ্লবী শক্তির বহিঃপ্রকাশে জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব শংকিত হয়ে ওঠে। এরা এইসব সংগ্রামের বিরোধিতা করে। এই সময় ১৯৪৬ সালের ২৯ শে জুলাই ধর্মঘটী পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কর্মচারীদের সমর্থনে বি পি টি ইউ সির ডাকে অবিভক্ত বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ঐ সময়ে অনেকের মনে হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সে ধারনা যে কতখানি ভ্রান্ত তা বুঝতে পারা গেল। ঐ সময়কার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক অভ্যুত্থান দেখে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিল সমগ্র পরিস্থিতি তাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। জনগণের বিপ্লবী শক্তিকে বিপথে চালিত করার জন্য তারা ১৯৪৬'র ১৬ই আগস্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেয়। কমিউনিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমিক ছাড়া, এই দাঙ্গা থেকে শ্রমিকশ্রেণীও মুক্ত ছিল না। এর প্রধান কারণই হলো শ্রমিকশ্রেণীর উপর বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাব। ফলে পরবর্তীকালে যখন আপসকামী বুর্জোয়া নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করল শ্রমিকশ্রেণী তখন সেক্ষেত্রেও কোন কার্যকরী হস্তক্ষেপ করতে পারে নি।

নভেম্বর বিপ্লবের পর থেকে ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এই মতাদর্শগত সংগ্রাম আজও চলছে। বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে এবং দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘাত প্রতিঘাতে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনার মান বাড়ছে।

শ্রমিক আন্দোলনে মতাদর্শের সংঘাত সেদিন থেকেই চলে আসছে একদিকে শ্রেণী সমন্বয়ে বিশ্বাসী সংস্কারপন্থী নেতৃত্ব শ্রমিক আন্দোলনকে সংগ্রাম-বিমুখ, পঙ্গু করে রাখতে চেয়েছে। অপরদিকে নভেম্বর বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদের জোয়াল থেকে মুক্ত করে শ্রেণী সংগ্রামের নীতির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করে, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বর্তমান অবস্থায় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সংগ্রামের প্রভাব শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে পড়েছে এই আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে সংগ্রামের এক একটি বাঁকে ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে।

একথা ঠিকই ১৯০৮ সালে তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘট থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী বহু রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু একথা আজও বলা যায় না যে, আমরা শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত করতে পেরেছি। বহু সংগ্রাম ও উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে চলেছে। এরই মধ্যে কোন কোন রাজ্যে শ্রমিক তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাব জাতীয় রাজনীতিতে গভীর ভাবে দাগ কেটেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালার শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক আন্দোলন ভারতের ধনিক শ্রেণীকে শংকিত করে তুলেছে, তীব্র গণআন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালায় কংগ্রেস সরকারের পতন হয়। কেরালায় বাম ও অন্য কিছু দলের মোর্চার সরকার গঠিত হয়েছিল।কিন্তু অন্য কয়েকটি দলের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন বাম ও গণতান্ত্রিক সরকারের পতন হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সমস্ত ষড়যন্ত্র ও আক্রমণকে প্রতিহত করে শ্রমিক, কৃষক ও জনগণ এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের পাঁচ বছর রাজ্য সরকারের কার্যাবলীর মূল্যায়ন করে জনগণ পুনর্বার বিপুল ভোটে কংগ্রেসকে পরাজিত করে বামফ্রন্টকে জয়ী করেছে। গত ৫ বছর বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে এ রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছে। অনুরূপভাবে ত্রিপুরাতেও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে গত ৫ বছর যাবত বহু আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতেসক্ষম হয়েছে। একটা বুর্জোয়া সংবিধানের অন্তগত এবং যখন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা ন্যস্ত, তখন একটা অঙ্গ রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সরকার পরিচালনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নেই। গত ৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার জনগণ বহু অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছে। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), যে পার্টি এই সরকারগুলির নেতৃত্বে আসীন তারা মার্কসবাদ লেনিনবাদের তত্ত্ব একটি বিশেষ রাজ্যে, বিশেষ অবস্থার মূল্যায়ন করে

(শেষাংশ ৪১৫ পাতায়)

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বিপুল সাড়া

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ভয়াবহ খরা-পরিস্থিতি চলেছে। মাঠ জ্বলছে, ফসল প্রায় সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই দুঃস্থ মানুষদের বাঁচাবার জন্য ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করবার জন্য আহ্বান জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন বহু ব্যক্তি, অনেক প্রতিষ্ঠান। ১৮ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ১৯৮২ পর্যন্ত যাঁরা ত্রাণ তহবিলে অর্থ দিয়েছেন তাঁদের নাম ও অর্থের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল ঃ

স্টেট কোঅর্ডিনেশন কমিটি অব দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গভমেন্ট এ্যামপ্লইজ ইউনিয়ন্স এন্ড এ্যাসোসিয়েশনস	৫০,০০০·০০
পাঠ ভবন স্কুলের ছাত্রবৃন্দ	১৬৮৩·৩৫
সারা বাংলা ৬৫ তম প্রাথমিক শিক্ষক অভ্যর্থনা সমিতি	৫০০০
কাশীনাথ পাণ্ডে	১৫১
শ্রী এম, জি, কুণ্ডু	৩০০
স্টাফ মেম্বার অব মেসার্স গেমন ইণ্ডিয়া লিমিটেড কালিঘাট থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট বিশ্বকর্মা পূজা কমিটি	১৫০১
অল বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং কলেজশিক্ষার্থী সংঘদ	৬০১
আই, এইচ, এম (পোর্টস) এণ্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব	১০০১
এইচ, জি, ক্লাই রিক্রিয়েশন ক্লাব	৫০১
ছাত্র, শিক্ষক কর্মচারী কাচড়া পাড়া হাইস্কুল (হায়ার সেকেণ্ডারী)	৩৬০
শ্রীগোপাল আচার্য	৫০০
টিচার্স অব মানিকতলা গার্লস হাইস্কুল	২২৬
সি, পি, আই, এম কলিকাতা জেলা কমিটি	১০,০০০
আই, পি, টি, এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি	৬৯১৫
মিনিস্টীরিয়াল ওয়ারকার্স ইউনিয়ন	১৫০০
বীরভূম স্কুল এ্যামপ্লইজ এ্যাসোসিয়েশন	২৫১
নাগারী হাইস্কুল টিচার্স কাউন্সিল বীরভূম	২৫০
W. B. C S. এ্যামপ্লইজ এ্যাসোসিয়েশন বীরভূম	৫১
শচীদুলাল সরকার সিউড়ি, বীরভূম	৫১
সি, আই, টি, ইউ মেদিনীপুর শাখা	৪০০১
কোলঘাট থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট ঠিকাদার মজদুর ইউনিয়ন	২০০০
W. B. S. E. B. ওয়ার্কাস ম্যানস ইউনিয়ন কোলাঘাট ডিভিশনাল কমিটি	২০০০০
স্টাফ মেম্বার অব ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক রিক্রিয়েশন ক্লাব, গড়িয়াহাট শাখা	৩০১
W. B. সলিসিটর এ্যামপ্লইজ ইউনিয়ন	৩২৬
পশ্চিম বড়িশা সরকারী আবাসন সমিতি	৫০১
গাঙ্গুলী বাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫০১
যুবসংঘ (তালপুকুর) দুর্গাপূজা উৎসব কমিটি দমদম	৩০১
মাতৃপল্লী সর্বজনীন পূজা কমিটি দমদম	৫০১
উত্তরবর্তে কুমার পাড়া বারোয়ারী	১০১
ইয়ং রিক্রিয়েশন ক্লাব বিরাটী	১০১
উদয়পুর সর্বজনীন পূজামণ্ডপ	২০১
কৃষ্ণ চক্রবর্তী লেন, সর্বজনীন পূজা কমিটি বালী	২৫
পাইকপাড়া বারোয়ারী পূজা কমিটি বালী	১০১
পাইকপাড়া মিলনী দুর্গাপূজা কমিটি	১০
পাইকপাড়া মিলনী দুর্গাপূজা কমিটি	৫০
রামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক পরিষদ	
পাইকপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি	৩৫১
সমর মুখার্জী এম, পি,	১০০
মাতৃমন্দীর সাংস্কৃতিক সংস্থা	৬৫
হাওড়া জেলা সি, পি, আই, এম	৫৭৭৬ ৭৬
চন্দ্রনগর আঞ্চলিক নাগরিক কমিটি সি, পি, আই, এম	৩৫১
শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মী লবন হ্রদ বিদ্যাপীঠ A. D. ব্লক কলকাতা ৬৪	২৪০
সলিল চৌধুরী এবং সম্প্রদায়	২০০১,১৮
বালী সারস্বত ব্যায়াম সমিতি	১০১
রাজকৃষ্ণ কুমার স্টীট সার্বজননী দুর্গোৎসব	২০১
বালী বেলুড় সিমান্ত পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব	১০১
খামার পাড়া সার্বজনীন পুজো সমিতি	১০১
তরুন তীর্থ রামমোচন সৈন স্ট্রীট বেলুড়	১০১
শ্রীহরিসভা সংঘ বেলুড়	৫১
বেলুড় শিবতলা বারোয়ারী	৫১
বেলুড় দক্ষিন পূর্ব শাখা (দুই) সি, পি, আই, এম	২০০
ভারতের যুব ফেডারেশন শাখা (১৪) বেলুড়	১০১
বেলুড় দক্ষিন পূর্ব শাখা (তিন) সি, পি, আই, এম	১৩১
বিজয়গড় কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫০১
সুলীবায় সম্মিলনী ক্লাব	৫১
শ্রীচুনী রঞ্জন সেন	১০০
চাকুরিয়া প্রগতি সংঘ	৩২০
বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংঘ	৫০১
ফ্রেণ্ডস্ সারকেল মাঝের হাট	২০১
খানী নবীন নগর কনসুমারস কোপারেটিভ স্টোরস্ লিমিটেড, কলিকাতা-৪৯	২০১
তরুন সংঘ নিমতা	১০১
সুভায় সংঘ নিমতা	৫১
২নং রামকৃষ্ণ পল্লী	৫১
পূর্ব আলীপুর সার্বজনীন সংস্থা	২০১
আলীপুর ফ্রেণ্ডস এ্যাসোসিয়েসন	১১১
ছাত্র সমাজ সম্মেলনী এবং আঞ্চলিক জনগণ মাঝের হাট	১১৮
নারায়ণ পল্লী সংঘ নিমতা	১০১
সানীনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১

প্রতাপগড় সার্বজনীন শারদীয়া দুর্গোৎসব কমিটি	১০১
সঙ্গম	৫১
শ্রীমতী পূর্নিমা ব্যানার্জী	৫
বরানগর যুব সংসদ	৩০১
দুর্গাপুর অগ্রণী সংঘ রানা প্রতাপ	১৯০
সলিল চৌধুরী এবং সম্প্রদায়	৫৫৬১·৯৮
দক্ষিন দমদম মিউনিসিপ্যাল পার্ক দুর্গাপূজা কমিটি	১০১
স্বাতী মুখার্জী বেলুড়	৫৮
জিগিসা বিধাননগর কলি-৬৬	৪৪৭
উপকার এ্যাথলেটিক ক্লাব	১০০১
অর্ধেন্দু	১০১
বসন্ত জুয়েলার্স	১০১
শিলিগুড়ি ক্রিড়া সংঘ	৩১০১
জাতীয় তরুণ সংঘ	১০০১
চণ্ডীচরন মেমোরিয়াল ক্লাব কলি-১২	৫০১
কালিকাপুর রামকমল সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১
কালিকাপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১
	৩০
সাহেবপুর	৫১
রায়পুর হাসানপুর	৫১
কালিকাপুর অভিযাত্রী সংঘ	৫১
চৌহাটি বিবেকানন্দ পল্লী সার্বজনীন	৫১
দুর্গোৎসব কমিটি ব্লক এ পোলঘাট	৫১
চৌহাটি বইতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি পোলঘাট	৫১
সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি দেশপ্রিয় ব্লক এ পোলঘাট	৫১
মানিকপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি পোলঘাট	৫১
মালঞ্চ মহিনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১
মালঞ্চ জয়কালী নিতাই সমাজ	১০১
দুয়ার পল্লী সার্বজনীন দুর্গোপূজা কমিটি	১২৫
ফোদালিয়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি	১০১
সুভাষ গ্রাম পল্লীমঙ্গল সমিতি	১০১
চাঙ্গাড়িপোতা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৩১
বৈশাখীপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১
চক্রবর্ত্তীপাড়া সার্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটি	১০১
হরিনাভি বালক সংঘ	৫১
হরিনাভি সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১
নন্দন কলোনী সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	২১
সেতার পল্লী সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (গাজীপুর)	১০১
রাজপুর কালিতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১
রথতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	২০১
তের পল্লী (জগদ্দল)	৫১
বার পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি অগ্রণী সংঘ	৫১
দক্ষিণ জগদ্দল কিশোর সংঘ	৫১
ময়রা পাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১
রাজপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (বাসতলা)	২২৫
বরেন্দ্র পাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১
বৈকুণ্ঠ পুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১
বোসপুকুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১
চৌহাটি তরুণ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১
দক্ষিণ ঘোষ পাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (সোনারপুর)	১০১
শিরীষতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১
গরগরা নওজোয়ান সংঘ	২০১
রেল কলোনী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১১৫
কালিবাড়ী নতুন পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১
ভৌমিক পাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১
গ্রীণ পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (নরেন্দ্রপুর)	১০১
কামাল গাজী শক্তি সংঘ (নরেন্দ্রপুর)	৫১
কারবালা ইসলামীক ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি	৫১
অজ্ঞান ঋষি রাজনারায়ণ	৫১
লেক গার্ডেন আদিবাসীবৃন্দ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	২৫
তরুণ সংঘ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১
লেক্ গার্ডেন পল্লী উন্নয়ন সমিতি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১
মিলন সংঘ ঋষি রাজনারায়ণ	৩১
উজ্জ্বল সংঘ (পেয়ারা বাগান)	৭৫
কিশোর সমিতি বরাল	৭৫
ইউথস বরাল	১০১
শান্তি সংঘ ঋষি রাজ নারায়ণ	৫১
বাদামতলা যুব সংঘ	৫১
বালক সংঘ ঋষি রাজ নারায়ণ	২৫
বরাল আদি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৩১
সুকান্ত সংঘ ঋষি রাজ নারায়ণ	৫১
মিলনায়তন ঋষি রাজ নারায়ণ	২৫
বারিণ মিতালী সংঘ	৫০১
সাংস্কৃতিক চক্র সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি গড়িয়া-১	৭০
গড়িয়া কৃষান মজদুর বাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১৫১
শ্রীনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি গড়িয়া	১০১
নবগ্রাম	৫১
বোয়ালীয়া যুবসংঘ ,,	৫১
গড়িয়া সম্মিলনী (পঞ্চদুর্গা)	২০১
গড়িয়া	৫১
নতুনপাড়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি গড়িয়া	২৫
বালিয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১
পশ্চিম বালিয়া ,, ,,	৫১
মিলনী (মহামায়া তলা) গড়িয়া	৫১
তরুণ সংঘ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি কামরাবাদ	১০১
আচার্য প্রফুল্ল সংঘ (চাঁদমারী) সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১
শ্রীবিজন ঘোষ কলি-৭৫	১০
সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি নাগের বাজার কলি-৭৪	৫০০১
শ্রীশিশির কুমার চ্যাটার্জী শ্রীরামপুর হুগলী	৫০
ভারতের যুব ফেডারেশন চুঁচড়া আঞ্চলিক কমিটি কামারপাড়া	১০০
শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী আর কে মিশন আশ্রম হাইস্কুল	২০৩
দেশ মেডিক্যাল (এইচ ও) কলি-১৬	১০০০
এ্যাসোসিয়েশন অফ ইনসপেক্টর অফ কো-অপ সোসাইটিস পঃ বঃ কলি-১২	১০০১
বালী কো-অপ ব্যাঙ্ক এণ্ড ক্রেডিট সোসাইটিস্ লিমিটেড বালী হাওড়া	৫০১

বিজনী বিহারী দাস কলি-৪১	১০
ফ্রেঞ্চ মোটরকার কো-লিমিটেড ওয়ারকার্স এমপ্লইজ ইউনিয়ন কলি-২০	৩০০
ডি, ওয়ালডি এমপ্লইজ ইউনিয়ন কোন্নগর হুগলী	১৫
শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারি চুচুঁড়া দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাইস্কুল কামারপাড়া চুচুঁড়া হুগলী	১০৫
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এ্যামপ্লইজ কো-অপ সোসাইটিজ লিমিটেড কলিকাতা-১৬	১০০১
অধ্যাপক এম, এম, দাস উপদেস্টা এ, এইচ, এবং ডি, এস, বিভাগ	১০০
অল, ইণ্ডিয়া ডিফেন্স একাউন্টস্ এমপ্লইজ এ্যাসোসিয়েশন সি, ডি, এ, (ফ্যাক্টরীজ) এম, ও কলি-	১১৮৫
অভিনেতৃ সংঘ কলি-১৩	১০,০০০
কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি কল্যানী নদীয়া	১,৫০০
W. B. E. C. S. C. এমপ্লইজ এ্যাসোসিয়েশন	১০৭৫
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র ঘোষ U. B. I. বিধাননগর শাখা কলি-৬	৫১
ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি বুরো প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-৭২	৩০১
কাটোয়া ব্লক-১ তন্তবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড কাটোয়া বর্ধমান	৫০১
শ্রী এন, ডি, মজুমদার কলি-৩১	৫
শ্রীশ্যামাপদ দে আর, আর, অফিস রানাঘাট নদীয়া	১০
L. I. C. I. কর্মচারী কালনা শাখা থানা কালনা বর্ধমান	৪০
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন বর্মন ও এস, ব্যানার্জী M. H. R. C. হাইস্কুল পুরুলিয়া	৫০
শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী অঞ্জনগড় জুনিয়র হাইস্কুল নদীয়া	১০১
শ্রী এ, গুহ ঠাকুরতা কলিকাতা-৩২	২০১
শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী মেমারী বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যামন্দির	৩১০
S. F. I এবং D. Y. F. I. বর্ধমান জেলা কমিটি	৭০০
শ্রীভাস্কর পালিত কলিকাতা-৩৩	১০০
শতদল সংঘ কলি-১৫	৮১
P. R. C চন্দননগর শাখা	৫০১
নবীনগড় সমিতি নবীনগড় যাদবপুর	৫১
শ্রীঅরুনকুমার চ্যাটার্জী (ভাগ্যপরীক্ষক) হুগলী	১০০১
নন্দননগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	২০১
রাজডাঙ্গা (ঠাকুরতলা) যুবসমিতি	৬১
রাজডাঙ্গা (নবপল্লী) পূজা কমিটি	৫১
পঞ্চান্ন গ্রাম সার্বজনীন পূজা কমিটি	৫২
লস্করহাট মিলনতীর্থ পূজা কমিটি	৫০১
নস্করহাট নবোদয় সংঘ পূজা কমিটি	৫০১
V. I. P. নগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি কলি	১০১
আটাবাগান কল্যাণ পরিষদ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫০০
সুকুমার মজুমদার সম্পাদক কল্যাণ পরিষদ	২৫
শ্রীনারাণ চন্দ্র দে	১১
শ্রীবিমল চন্দ্র পাল (নস্কর)	১০
শ্রীদীপক নন্দী নন্দী ডেকরেটরস ২৪ পরগনা	১৫
শ্রীনিহারকান্তি সরকার	১৫
ব্রহ্মপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	২০১
অগ্রদূত হরিসভা	১০১

মিলনতীর্থ ,, ,,	১০১
ঘুসুরী প্রজেক্ট বালি, বেলুড় সি, পি, আই, (এম)	১০১
মেসার্স এস, এম, জৈন এণ্ড কোং বেলুড় হাওড়া	১০০১
ওমপ্রকাশ রাজকুমার বেলুড় হাওড়া	১০১
মেসার্স আজাদ আবরন এণ্ড মেটাল স্টোর্স বেলুড় হাওড়া	২১০১
রাম নিয়মজী গুপ্ত বেলুড় হাওড়া	১০০১
পোড়াবস্তী ক্যাম্প কমিটি	৫১
হলিডে এ্যাসোসিয়েশন নেতাজী নগর	১০১
টালীগঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব	১০১
নেতাজী সংঘ	১০১
নেতাজীনগর মহিলা সমিতি	১০১
ছাত্রবন্ধু ক্লাব	১০১
মিলন সমিতি	১০১
গান্ধী কলোনী কেন্দ্রীয় সমিতি কলি-৪০	১৫১
অভিজান গান্ধী কলোনী রিজেন্ট পার্ক কলি-৪০	১০১
নেতাজীনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০০১
৪ এস, ই ক্লাব	১০০১
বঙ্গভারতী পরিষদ	১০১
বর্ণালী নেতাজী নগর কলি-৪০	১০১
নেতাজী নগর বাস্তহারা সমিতি	৫০১
নেতাজী নগর কলেজ কর্মচারী সমিতি কলি-৪০	৫০১
দুর্গাপূজা সাব কমিটি এল, আই, সি স্টাফ কোয়ারটার নিউ আলীপুর	৫০১
এ্যাসোসিয়েশন অফ লাইসেন্স এল, আই, সি, স্টাফ কোয়াটার নিউ আলীপুর কলি-৫৩	৫০১
গার্ডেনরিচ ওয়ার্কসপ সুপার ভাইজারী স্টাফ এ্যাসোসিয়েশন কলি-২৪	১০০১
ব্যাঙ্কপাড়া বিজয়া সম্মেলনী ব্যারাকপুর	৫১
স্ফুলিঙ্গ চন্দননগর হুগলী	৫১
নৈইহাটি মিউনিসিপ্যাল মজদুর কর্মচারী ইউনিয়ন নৈহাটি ২৪ পরগনা	৫০১
মেসার্স কে, এম, পি, ওয়েল মিল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন	১৮০
নেপাল চন্দ্র হালুইকর ওয়ারকার্স ইউনিয়ন	১০১
শ্রীবিমলেন্দু দত্ত চীফ মিনিস্টার্স সেক্রেটারী	৫
শ্রী এম, সেরপা প্রেসিডেন্ট লাভাবাগান সুধার কমিটি	৫০০
রবীন সংঘ দেশবন্ধু পাড়া শিলিগুড়ি	৩০১

(৪১২ পৃষ্ঠার পর)

সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছে. সফলভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবকে কিন্তু আজও ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটেনি । সারা ভারতের ক্ষেত্রেও বটেই এমন কি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ হয়েছে বললে খুবই অতিশয়োক্তি হবে।

নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব সেদিনই সম্পুর্ণ হবে যখন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই উপলব্ধি আসবে যে বর্তমানের এই যুগে ধরা সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া, বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রের অবসান ছাড়া তাদের মুক্তির আর কোন রাস্তা নেই

অন্যেরা কি বলছেন

সত্যের অপলাপ

গত ১৫ অক্টোবর লোকসভায় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য অবিলম্বে ৯,০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে—তাছাড়া জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর জন্যও ৬.৭৪ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গকে সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এটা কোন অতিরিক্ত সরবরাহ নয়—কেন্দ্র যে খাদ্যশস্য ও অর্থবরাদ্দ করেছিল তারই একাংশ।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর বিবৃতি পড়ে মনে হবে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যই কেন্দ্র কৃপাবশতঃ এই "বিশেষ" ব্যবস্থা নিয়েছে।

রাও বীরেন্দ্র সিং লোকসভায় সমর মুখার্জির উত্তরদানকালে উপরোক্ত ঘোষণাটি করেন। এতদিন পশ্চিবঙ্গের জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর জন্য সাহায্য বরাদ্দ আটক রাখা হয়েছিল কেন? এর উত্তরে কৃষিমন্ত্রী বলেছেন তা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। মন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের হিসাব দেয় নি। মন্ত্রী আরও বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ নাকি ১৩.৩৮ কোটি টাকা খরচ করতে পারেনি—অতএব "আর্থিক শৃঙ্খলা" রক্ষার স্বার্থেই পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই খাতে বরাদ্দ অর্থ সরবরাহ করা হয়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গের "দুর্দশায়" "বিচলিত" হয়েই কেন্দ্র ৬.৭৪ কোটি টাকা সরবরাহ করছে।

উল্লেখ্য, এটা কোন নতুন কুৎসা নয়। ১৯৮০ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিকল্পিত ভাবে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এই কুৎসা রটনা করে চলেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী এবং জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর জন্য সরবরাহ করা খাদ্যশস্য ব্যবহারের হিসাব দাখিল করেনি। অথচ রাজ্য-সরকার কেন্দ্রকে নিয়মিত হিসাব দিয়ে গেছে। আবার এখন সেই বস্তাপচা ও পুরাতন কুৎসারই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। এমন এক সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যান পেশের মাধ্যমে এই কুৎসা রটনা করছে যখন সারা পশ্চিমবঙ্গ প্রচণ্ড খরার কবলে পড়েছে এবং রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে।

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি, কেন্দ্রীয় কৃষি-মন্ত্রীর বক্তব্য সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উল্লেখ করেছেন; রাজ্য সরকার শতকরা ৫০ ভাগের ওপর হিসাব দিয়ে দিয়েছে। ভূমি দপ্তরের মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন; জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে মোট ২২ কোটি ১৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা—রাজ্য সরকার ১২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা খরচের হিসাব কেন্দ্রকে পাঠিয়েছে—অর্থৎ শতকরা ৫০ ভাগের বেশি খরচের হিসাব পাঠানো হয়েছে; পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের গাইড-লাইন অনুযায়ীই কাজ করেছে। অতএব রাও বীরেন্দ্র সিং-এর বক্তব্য সঠিক নয়।

সরকারী বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিতরণের জন্য খাদ্যশস্য সরবরাহ সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নানান বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রেখেছেন। বাস্তব ঘটনা হলো, পশ্চিমবঙ্গের যে ন্যূনতম চাহিদা তার অর্ধেকও বরাদ্দ করা হচ্ছে না; যা বরাদ্দ করা হচ্ছে তারও একটা বড় অংশ সরবরাহ করা হচ্ছে না। রেলওয়ের যদি কোন গাফিলতি থাকে তাহলেও সে দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য সরকারের নয়।

শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্র খরাত্রাণ খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করেছে তা আর বাড়াতে সে রাজী নয়।

এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বামফ্রন্ট বিপর্যয়কর খরা পরিস্থিতির মোকাবিলায় এক আপৎকালীন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বামফ্রন্ট কমিটি রাজ্যের ভয়াবহ খরা পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, এবং খরা পরিস্থিতির মোকা-বিলায় কেন্দ্রের কাছে প্রদত্ত দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

এই আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার জন্য রাজ্যের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

১৮. ১০. ৮২ গণশক্তি

প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারি (শিক্ষা)'র সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষিত সিদ্ধান্ত

[১] প্রাথমিক শিক্ষকদের অক্টোবর, ১৯৮২-র বেতন, উৎসব-অগ্রিম ও এককালীন অনুদান/একসগ্রাসিয়া বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকগণকে (প্রাথমিক শিক্ষা) দেওয়া হয়েছে। এইসব টাকা প্রাথমিক শিক্ষকগণ যাতে ২২ অক্টোবরের আগে পান, সেইমত ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) অফিসের কর্মিগণকেও এ বিষয়ে আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য অনু.রাধ করা হচ্ছে। এইসব খাতে মোট খরচের পরিমাণ আনুমানিক ১৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা।

[২] প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন-নির্দেশিকা রচনা করা হয়েছে ও তা ৬০,০০০ কপি ছাপান হয়েছে। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই পুস্তিকা পূজার বন্ধের আগেই পৌঁছে দেবার জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তিকা প্রেস থেকে সরবরাহ নেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকটি জেলায় বেশ আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে ও সেই সব জেলায় মহকুমা চক্রে জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সভাপতিগণের নেতৃত্বে, পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সহযোগিতায় ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকগণের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আলোচনায় অনেক অভিভাবক ও শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী জনসাধারণও অংশ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

[৩] প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক বন্টন বিষয়ে অতীতে যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, তা দূর করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি ও প্রতিটি পৌরসভার অন্তর্গত প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীভিত্তিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সঠিক ভাবে নির্ধারণের জন্য সমীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। জেলা বিদ্যালয় পর্ষদ ও বিদ্যালয় পরিদর্শকগণকে সাত দিনের মধ্যে এই সব প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে ভবিষ্যতে পুস্তক বন্টনের ত্রুটি দূর হবে।

[৪] নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর একটি সমীক্ষা করে তথ্য সরবরাহ করার জন্য জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সভাধিপতিগণকে প্রতিটি জেলায় একটি করে কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

[ক] বিদ্যালয়ের গৃহ সমস্যা,

[খ] শিক্ষক-ছাত্র অনুপাতের বৈষম্য,

[গ] এক-শিক্ষক-বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা

[৫] প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের নিয়মিত উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিদর্শন ব্যবস্থা নিয়মিত ও সুদৃঢ় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।



আবেদন

বন্ধুগণ,

প্রতিদিন জিনিসপত্রের দরদাম বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তবু, আপনারা সকলেই কিছু না কিছু সঞ্চয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন যাতে সন্তানদের বড় করে তোলা যায়, জরুরী প্রয়োজন মেটানো যায় এবং অবসর জীবন যাপনের সময়ে ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি নিয়ে ভাবতে না হয়। আপনার সঞ্চয়ের সুযোগ করে দিতে বর্তমানে অনেকগুলি সংস্থা কাজ করছে। সমস্যা হল কোন্‌টা বেছে নেবেন।

জাতীয় স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প আপনাকে বেশ কয়েকটি সেরা সঞ্চয় প্রকল্প উপহার দিচ্ছে। এই প্রকল্পগুলি আয়করের সুবিধাসহ উচ্চ হারে সুদ এবং আরো বড় কথা, পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়। সম্প্রতি প্রবর্তিত সামাজিক নিরাপত্তা সার্টিফিকেটের প্রকল্পটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এজন্য যে উচ্চ হারে সুদ দেওয়া ছাড়াও এতে জীবনবীমার সব কয়টি সুবিধা রয়েছে।

আমি আপনাদের এই প্রকল্পগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে আবেদন জানাচ্ছি। এতে এই রাজ্যও উপকৃত হবে কেননা আপনাদের বিনিয়োগের একটি অংশ দিয়ে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি যাতে নেওয়া যাবে এবং এর ফলে আপনার ও আপনার সন্তান-সন্ততির কল্যাণ সাধিত হবে।

জ্যোতি বসু

আবেদন

বন্ধুগণ,

এটা নিদারুণ বাস্তব কথা যে প্রচলিত সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আমরা অশেষ আর্থিক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে বাধা হচ্ছি। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিদারুণ পরিশ্রমের দ্বারা যে রোজগার করি তার থেকে সঞ্চয় করার জন্য যে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না এ সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কঠোর শ্রমের বিনিময়ে চায় বর্তমানের স্বস্তি আর দুশ্চিন্তাহীন ভবিষ্যৎ। এই উদ্দেশ্যকে আরো ভালভাবে সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের যৎ-সামান্য আয়ের একটি সামান্য অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চেষ্টা করি এবং এই জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ জমা রাখি। সম্প্রতি দেখা গেছে যে কয়েকটি ভূয়া প্রতিষ্ঠান জমা-প্রকল্পে বেশি সুদের প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষকে নিঃস্ব করেছে। আজ তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কি ভাবে অর্থ সঞ্চয় করলে লাভ হবে এবং ঐ অর্থ নিরাপদে থাকবে। সেই সঞ্চয়ের জন্য সাম্প্রতিক কালে ডাক-ঘরের মাধ্যমে প্রবর্তিত অদ্বিতীয়, লোভনীয় জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের সাহায্য নিন। আপনার কষ্টার্জিত অর্থ এখানে যে শুধু সুরক্ষিতই থাকবে তাই নয় এই বিনিয়োগ আপনাকে এনে দেবে বেশ ভাল অঙ্কের করমুক্ত সুদ। সামাজিক নিরাপত্তা সার্টিফিকেট কিনে নিয়োজিত অর্থের সুরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও জীবন-বীমার ক্ষেত্রে প্রদত্ত সব রকমের সুবিধা ভোগ



করুন। মনে রাখবেন যে এই প্রকল্পে নিয়োজিত আপনার অর্থের একটি ক্ষুদ্র অংশ জাতীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান হয়ে উঠতে পারে। আমাদের এই প্রিয় রাজ্যটিকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই যখন নিজ নিজ করণীয় ভূমিকা থাকা দরকার আমরা আমাদের সেই সামাজিক কর্তব্য থেকে দূরে সরে থাকবো কেন?

আপনার সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ, সঞ্চয়ের নিরাপত্তা ও অধিক প্রত্যর্পণমূল্য সর্বোপরি আপনার প্রিয় রাজ্যটিকে পুন-র্গঠনের জন্য আপনি জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করুন।

রাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থ, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও হুগলী প্রিন্টিং কোং লিঃ, ৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ৭০০ ০৭১ হইতে মুদ্রিত।



মহান নভেম্বর বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ভূমি সংস্কারের সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সাল। সোভিয়েতের চারিদিকে নবজাগরণের প্লাবন। (ছবিতে) উজবেক কৃষকেরা ভূমি ও জলের ডিক্রির ঘোষণাপত্রটি পড়ছেন, সেদিন থেকে তারা তার মালিকানা লাভ করেন (মনোরঞ্জন বড়ালের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।